প্রতিবাদ সভায় সিঙ্গুরের মানুষ

সিঙ্গুরে সংহতি উদ্যোগের মিছিল আটকাতে পুলিশি বন্দোবস্ত্

২রা ডিসেম্বর জোর করে বেড়া দেওয়া পাকা ধান ভর্তি নিজের জমিতে যাওয়ার অপরাধে 'বিচারক' পুলিশের হাতে রক্তাক্ত সিঙ্গুরের কৃষক

সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে ‘শিল্পায়ন’ —একটি অধিকার প্রেক্ষিতে

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি

হুগলী জেলা কমিটি

১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে ‘শিল্পায়ন’—একটি অধিকার প্রেক্ষিতে
Industralisation on Agricultural land in Singur
–A Rights Perspective

প্রকাশক
অশোক দেবরায়
সম্পাদক, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
হুগলী জেলা কমিটি
সেনপাড়া, পোঃ বুড়াশিবতলা, চুঁচুড়া ফোন ২৬৮০১৪৩৯

APDR Hooghly District publication
10 February 2007

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ১৮ মদন বড়াল লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

দাম ২৫ টাকা

কেন এই প্রকাশনা

এই মুহূর্তে সিঙ্গুর শুধু এ রাজ্যেই নয়, সারা দেশ তথা আন্তর্জাতিক মহলেও আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। সিঙ্গুরে টাটাদের ছোট মোটরগাড়ির কারখানার জন্য রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ সহ অতিতৎপরতা ও বলপ্রয়োগ সারা দেশেই বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে আলোচনা ও আন্দোলনের প্রেক্ষিত করে তুলেছে। এই বিতর্ক ও আন্দোলনে এ পি ডি আরও অংশীদার। এই প্রসঙ্গে এ পি ডি আর-এর বক্তব্য গত কয়েকমাসে বহু পথসভা, লিফলেট ও পোস্টারের মাধ্যমে বারবার প্রচার করা হয়েছে। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের ঘটনায় মানুষের অধিকার যে ভাবে লুণ্ঠন করা হয়েছে এক কথায় তা অভূতপূর্ব।

গত ১৮ মে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে টাটাদের জন্য জমি অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা করার পর ২৫ মে টাটাদের প্রতিনিধি সিঙ্গুরে জমি পরিদর্শনে যান। সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, সিঙ্গুরের চাষীরা টাটার প্রতিনিধিদের বাধা দিয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। আমরা উপলব্ধি করি যে সিঙ্গুরের স্থানীয় মানুষ সরকারের এই পদক্ষেপকে মেনে নিতে পারছেন না—নিজেদের অধিকার, জীবন-জীবিকা, জমি রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতির সময় পর্যন্ত সরকারি নিষ্পেষণে আন্দোলনের মৌলিক চরিত্র দমন করা যায়নি, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ’৭২ সালের জন্মলগ্ন থেকেই এ পি ডি আর গত ৩৫ বছর ধরে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের পাশে থেকেছে। এ ক্ষেত্রেও তাই এ পি ডি আর হুগলী জেলা কমিটি গত ১৫ জুন সিঙ্গুরের এলাকা ঘুরে দেখা এবং স্থানীয় মানুষের বক্তব্য শোনার জন্য সিঙ্গুরে অনুসন্ধান শুরু করে।

এলাকায় গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেতে হয় একরের পর একর সবুজ প্রান্তর দেখে। অবাক হতে হয় এই উর্বরা জমিকেই সরকার একফসলা, অনাবাদী বলে প্রচার করে কারখানা হওয়ার পক্ষে সওয়াল করছে। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে এলাকায় উন্নত সেচের বহুবিধ ব্যবস্থা এবং মূলতঃ এলাকার জমি বহুফসলী এ কথা জানতে পারি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আরও জানতে পারি, এলাকার মানুষ চাষ-বাস করে নিরাপদে ও শান্তিতে রয়েছেন বলেই মনে করেন। এই হাজার একর জমির সাথে যুক্ত পনেরো হাজার পরিবার। কৃষকরা জোরের সাথেই বলেন যে, প্রাণ থাকতে তাঁরা জমি দেবেন না।

আমরা স্থানীয় বি ডি ও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতির কাছ থেকে জানতে পারি যে, এই প্রকল্পের ব্যাপারে তাদের মতামতই নেওয়া হয়নি। সরকার জমি অধিগ্রহণের জন্য ৪ নং ধারা অনুযায়ী নোটিশ দেবার পর আমরা হুগলী জেলা শাসককে চিঠিদিয়ে জানতে চাই জমির চরিত্র কি, কতজন জীবিকা হারাবেন, তাঁদের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, পুনর্বাসনের পরিকল্পনা কি, টাটাদের জমি দেওয়ার শর্ত ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তর পাই না। টাটাদের সঙ্গে সমঝোতাপত্র করার সমগ্র বিষয়টি ‘ট্রেড সিক্রেট’ বলে যেভাবে আড়াল করা হয়েছে,

তাতে তথ্য জানার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করে। নৈতিকতার চূড়ান্ত খেলাপ করে এই ‘ট্রেড সিক্রেটে’র দোহাইও সাধারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারেন না।

এর পর শুরু হয় জমি দিতে অনিচ্ছুক মানুষদের উপর প্রশাসন ও পার্টির বলপ্রয়োগ। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোকই জমি দেবার বিরুদ্ধেই সংগঠিত হতে থাকেন।

২৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়। শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কেউই রেহাই পায় না পুলিশের অত্যাচার থেকে।পুলিশি সন্ত্রাসের শিকার রাজকুমার ভুল মারা যান ২৬ সেপ্টেম্বর। গ্রেপ্তার করে গ্রামের গৃহবধূকে বিস্ফোরক পদার্থ আইনে অভিযুক্ত করে। এঁদের মুক্তি ও পুলিশের শাস্তির দাবিতে এ পি ডি আর প্রচার চালায়, বিক্ষোভ দেখায়। জমি অধিগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে সিঙ্গুরের মানুষের বক্তব্য শোনার জন্য ২৭ অক্টোবর জনশুনানির আয়োজন করা হয়। তারপর ২ ডিসেম্বর জমিতে জোর করে বেড়া দেওয়া জন্য পুলিশি অত্যাচারের বীভৎসতা তো টি ভির দৌলতে সকলের জানা। এর বিরুদ্ধেও আমরা মিটিং-মিছিল, অবস্থান, বিক্ষোভ কর্মসূচী চালাই।

মেধা পাটকরের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যে জঘন্য প্রচার ও আটকনীতি চালায়, তার বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়। রাজ্য সরকার ‘শিল্পায়ন’ তথা ‘উন্নয়নে’র দোহাই দিয়ে যে ভাবে অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক, অমানবিক চণ্ডনীতি চালিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে ক্রমশঃ বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের জনমতও সংগঠিত হয়। সিঙ্গুরকে ১৪৪ ধারা জারি করে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ‘বহিরাগত’র তত্ত্ব আমদানি করে সিঙ্গুরের আন্দোলনের প্রতি গণতান্ত্রিক মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নেবার চেষ্টা চলে। বিধানসভায় ২৩৫-৩৫ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর দেখিয়ে বিধানসভার বাইরের কোটি কোটি মানুষের মতামতকে অগ্রাহ্য করার ঔদ্ধত্যে মুখ্যমন্ত্রী টাটা প্রকল্পের ‘কেশস্পর্শ’ও করতে না দেওয়ার শপথ নিয়েছেন। অথচ পুলিশ ও পার্টিকর্মীদের পাহারায় অবরুদ্ধ সিঙ্গুরে ১৮ বছরের কিশোরী তাপসী মালিককে পুড়িয়ে মারা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জনমতের চাপে সি বি আই-এর হাতে তদন্তভার তুলে দিয়ে একই সঙ্গে সি আই ডিকে লেলিয়ে দিয়েছেন তাপসীর চরিত্রে ফাঁক খুঁজে হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার জঘন্য চেষ্টায়।

এ সমস্ত অভিযোগের উত্তরে সরকারের একটাই দোহাই—শিল্পায়ন-উন্নয়ন-সভ্যতার অগ্রগতি! যারা বিরোধিতা করবে তারা শিল্পবিরোধী, উন্নয়ন বিরোধী—অতএব চক্রান্তকারী। কিন্তু অনুসন্ধানের পর তথ্য বিচার করে আমাদের মনে হয়েছে—উন্নয়ন কার জন্যে? মানুষের জন্য না টাটার জন্য? যাঁরা জমি, জীবিকা হারাবেন, তাঁদের কোন যুক্তিতে বলি দেওয়া হবে? তাঁদের বাঁচার অধিকার, জীবিকার অধিকার, জীবিকার জন্য আন্দোলনের অধিকার আমরা সমর্থন করি। সরকার যে উন্নয়নের মডেল সামনে রেখে ওই অগণতান্ত্রিক, অমানবিক দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে মানুষের প্রশ্ন তোলার, প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। সরকারের

কাছ থেকে বহু চেষ্টা করেও কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছেনা। তথ্যের অধিকার কাগুজে আবর্জনায় পর্যবসিত। তাই আমাদের মনে হয়েছে সরকারের এই উন্নয়নের মডেলকে তথ্য এবং বিশ্লেষণের অস্ত্রে শব-ব্যবচ্ছেদ করা প্রয়োজন। তাই আমরা অনুভব করি একটি তথ্যপূর্ণ প্রকাশনার । এ পি ডি আর-এর জেলা সভাপতি অমিতদ্যুতি কুমারের উপলব্ধি ও বিশ্লেষণপূর্ণ নিবন্ধটি এই সময়ে সিঙ্গুর ঘটনাকে বুঝতে সাহায্য করবে।

সি পি এম নেতৃত্ব যে সমস্ত রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ও যেখানে তারা বিরোধীপক্ষ, এমন সমস্ত রাজ্যের জমি অধিগ্রহণের আন্দোলনগুলিকে প্রত্যক্ষ করলে স্পষ্টতই রাজনৈতিক দিশার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রশ্নে, বিশেষত জমি অধিগ্রহণ ইস্যুতে স্পষ্ট দ্বিচারিতা প্রকাশ পেয়েছে। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে উঠে আসা প্রশ্নের কোনো উত্তর সরকার দিতে চাইছে না। সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্যা বৃন্দা কারাত-এর একটি লেখায় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। সরকারি বক্তব্য হিসেবে সেটাকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য সে লেখাটিও অন্তর্ভুক্ত করা হল। উন্নয়ন-শিল্পায়ন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেঝ) নিয়ে সি পি আই (এম) দল ও তার নেতৃত্বাধীন সরকারের দ্বিচারিতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বামদলগুলির পক্ষ থেকে পেশ করা স্মারকপত্রে অনেকাংশেই উন্মোচিত। নর্মদা আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন ও উচ্ছেদ প্রশ্নে সর্বভারতীয় স্তরে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জনশুনানির জন্য গঠিত পিপলস্ কমিশন এর প্রধান হিসেবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যানুসন্ধানের সুবাদে সিঙ্গুর প্রশ্নে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সিঙ্গুরের প্রেক্ষাপটে তাঁর একটি লেখাও অনেকগুলি বিষয়কে প্রাঞ্জল করতে পারবে। মূল লেখার আঙ্গিক বজায় রাখার জন্যই এই তিনটি লেখা ইংরাজিতেই রাখা হল। এ পি ডি আর যে সব প্রাসঙ্গিক নথি ও তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে সেগুলি সরকারি মিথ্যাচারকে অনেকটাই উন্মোচন করতে পারে। তারও কিছু এখানে রইলো।

এটা পূর্ণাঙ্গ সংকলন নয়—তারই একটা প্রাথমিক ধাপ ভেবেই আমাদের এই প্রয়াস। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ প্রশ্নে বেআইনী কাজগুলির প্রশাসনিক সুরাহার কোনো ইঙ্গিত না পেয়ে আমরা হাইকোর্টে একটা মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছি। এ নিয়েও আলোচনা যথাসময়ে করতে হবে। আমরা চাই আরো বিতর্ক, আরো মতামত।

অশোক দেবরায়
সম্পাদক, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
হুগলী জেলা কমিটি

১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে 'শিল্পায়ন' —একটি অধিকার প্রেক্ষিত

১। কেন এই প্রকাশনা ৩-৫
২। সূচীপত্র ৬
৩। সিঙ্গুর—অধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে—অমিতদ্যুতি কুমার ৭-৪০
৪। সিঙ্গুর বি ডি ও অফিসে ২৬ সেপ্টেম্বরের পুলিশি সন্ত্রাস এবং রাজকুমার ভুলের মৃত্যু—APDR-এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ৪১-৪৮
৫। পুলিশি নির্যাতনে পুত্র রাজকুমার ভুলের মৃত্যুর বিষয়ে তার বাবা দ্বারিকানাথ ভুলের অভিযোগপত্র ৪৯-৫০
৬। সিঙ্গুরে জনগণের সংগ্রামের উপর জনশুনানি ও পরবর্তী তদন্ত—একটি অন্তর্বর্তী কালীন রিপোর্ট ৫১-৬৮
৭। Government Notification for Acquisition of Land u/s 4, Land Acquisition Act,1894 Hooghly No. 273-LA/IV-6/2006-07 Dated: 20/07/2006. ৬৯-৭০
৮। APDR Hooghly Dist. Commttee letter dated 26.7.06 to Tata Motors ৭১
৯। Tata Motors Reply dated 27.7.06 to APDR letter ৭২
১০। PRESS RELEASE ISSUED BY TATA MOTORS ON MAY 18, 2006 ৭২
১১। জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে এবং শুনানির দাবি করে প্রশাসনের কাছে APDR-এর আবেদন ৭৩-৭৫
১২। AMNESTY INTERNATIONAL Public Statement India: Deaths in West Bengal during protest against new industrial project ৭৬-৭৭
১৩। তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ অনুসারে APDR-এর আবেদনের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম (WBIDC)-র চিঠি ৭৮-৮০
১৪। কৃষিতে সিঙ্গুর ব্লক—কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, সিঙ্গুর, হুগলী ৮১-৮২
১৫। Singur - The truth about the subversion of truth *Singur: Looking Back, Looking Forward Medha Patkar* ৮৩-৯০
১৬। Singur: just the facts, please Brinda Karat ৯১-৯৪
১৭। Left Parties' Note on Special Economic Zones ৯৪-১০১
১৮। এই সংকলনে উল্লিখিত আইনের ধারাগুলির সংকলন ১০২-১০৫
১৯। জমি দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের আদালতে পেশ করা হলফনামা ১০৬
২০। সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের প্রস্তাবিত কারখানা এলাকার নক্সা ১০৭
২১। সিঙ্গুর আন্দোলনের একটি অসম্পূর্ণ দিনলিপি ১০৮-১১২

সিঙ্গুর—অধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে

অমিতদ্যুতি কুমার

সাতমাস আগে সিঙ্গুর নামটি তেমন পরিচিত ছিল না। আজ এটি একটি গ্রামাঞ্চলের নামের পরিবর্তে একটি চর্চিত, আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে সারা ভারতে তো বটেই, সারা পৃথিবীতেই আলোড়ন তুলেছে।

প্রথম দিন, যেদিন ভারতের কর্পোরেট জগতের অন্যতম শিরোমণি, ভারত সরকারের বিদেশী বিনিয়োগ সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রতনলাল টাটাকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গুরের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, বাস্তবিকপক্ষে সেদিন থেকেই সিঙ্গুরের মানুষ পথে নেমে পড়েছিলেন। দিনটা ছিল ১৮ মে, ২০০৬। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, টাটাদের ছোট মটরগাড়ি প্রকল্পের জন্য হুগলী জেলার সিঙ্গুরের এক হাজার একর জমি টাটাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ঐ দিনই নাকি রতনলাল টাটার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়—পরে তা অস্বীকারও করা হয়।

আরও প্রায় চারমাস পরে, বস্তুত সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই সিঙ্গুর নিয়ে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং দ্রুত তা গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। মিথ্যাচার, অর্দ্ধসত্য প্রচার, প্রলোভন, ভীতিপ্রদর্শন, চরিত্র হননের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সত্বেও সিঙ্গুরের কৃষকদের মনোবল ভাঙা যায়নি এবং তা গোপালনগর-বাজেমেলিয়া-খাসেরভেড়ি-বেড়াবেড়ি-সিংয়ের ভেড়ি জয়মোল্লার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশেই। 'দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়'—কর্মচ্যুতি ও অনাহারের সমূহ সম্ভাবনা রাজনৈতিক দল-মত-বিশ্বাসের, নারী-পুরুষে ভেদাভেদের, বয়স ও সামাজিক অবস্থানের সব বেড়া ভেঙে দিয়ে গত তিরিশ বছরে দেখা যায়নি এমন এক সংহতি গড়ে তুললো।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের বা মানুষের জমি এই প্রথম কেড়ে নেওয়া হচ্ছে—ব্যাপারটা এমন নয়। রাজারহাট-ভাঙ্গর-বক্রেশ্বর-হলদিয়া-চাঁদমনি-বোলপুরের মানুষের করুণ অভিজ্ঞতা রয়েছে—কিভাবে তাঁদের পরিবেশ, তাঁদের জমি, তাঁদের আশ্রয় কেড়ে নিয়ে শিল্পপতি ও প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে-'উন্নয়ন', 'শিল্পায়ন' এসব গালভরা বুলির আড়ালে। প্রতিবাদ তাঁরা করেছিলেন—কিন্তু পুলিশি এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস তাঁদের প্রতিবাদ উড়িয়ে দিয়েছিল। ২০০৩-এর মানবাধিকার দিবসের প্রত্যুষে কলকাতার খালপাড়ের বস্তিবাসীদের ঝুপড়িগুলো যখন বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে আগুন লাগিয়ে হাজার দশেক মানুষকে নিরাশ্রয় করা হল, তখনও কলকাতার বামপন্থী বিবেক দংশন অনুভব করেনি। বোলপুরের উপকণ্ঠে যখন নগরায়নের রথে ঐতিহ্য- পরম্পরা-পরিবেশ,

তার সঙ্গে মানুষের অনুভূতি গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, মহাশ্বেতার মতো মানুষেরা যখন দাঁড়িয়েও পড়েছিলেন ঐ ভূমি-মেধ যজ্ঞের রাজপথে তখনও প্রতিবাদ শাসকদের টনক নড়াতে পারেনি—সিঙ্গুর কিন্তু শিরোনাম হয়ে উঠেছে, অতি কৃপণ সাম্প্রতিক ইতিহাসও সিঙ্গুরকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

চিরাচরিত নিয়মেই প্রথমে অবজ্ঞা তারপরে বদনাম শেষমেশ প্রচণ্ড বিরোধিতার তাগিদে এমনকি শাসক দলের মুখপত্র 'গণশক্তি'র গত আট মাসের প্রতিটি সংখ্যাতেই সিঙ্গুর প্রসঙ্গকে গড়ে দুটো করে জায়গা দিতে হয়েছে। দিতে হয়েছে, কারণ সিঙ্গুরের মানুষ, সিঙ্গুরের আন্দোলন নিজেদের মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের অধিকার রক্ষার, নিজেদের আবাদভূমি তথা আবাসভূমির অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের পাশাপাশি উন্নয়ন-শিল্পায়ন-নগরায়ন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্ছেদ-কৃষিজমি ধ্বংস, স্বচ্ছতা-গণতন্ত্র এসব বিষয় নিয়ে অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছেন।

বিষয়গুলো যত সামনে এসেছে, বিতর্ক যত গভীর হয়েছে প্রশাসন এবং সি পি আই (এম) তত বেশি মিথ্যাচার এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। জীবন এবং মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের অধিকারের সপক্ষে সিঙ্গুরের মানুষের আন্দোলন আর তাঁদের একার আন্দোলন হয়ে থাকেনি। বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক তাত্বিক, সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছেন—উন্নয়নের যে মডেল ৯৬ শতাংশ মানুষকে স্পর্শও করতে পারেনা—তার দরকারই বা কী এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়েও জবাব খোঁজার চেষ্টা চলেছে। অতীত ও সাম্প্রতিক বিশ্বের অভিজ্ঞতা, তথ্য ও পরিসংখ্যান, বিশেষজ্ঞদের মতামত এসব দিয়ে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে—সরকার ভুল পথে চলছে। বেকারত্ব এবং শিল্প ক্ষেত্রের অচলাবস্থা দূর করার জন্য এ ধরনের প্রকল্পই প্রয়োজন ছিল কি না সে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে এটাই যে প্রয়োজন তা কে, কবে, কোথায় ঠিক করলো?

প্রশ্ন উঠেছে, শিল্পায়ন-নগরায়নের প্রয়োজনীয় জমি নির্বাচন কিভাবে হবে, কৃষিজমিকে শিল্পায়নে ব্যবহার করার বর্তমান ও ভবিষ্যত ফল কী হতে পারে, কৃষিব্যবস্থাকে বিপন্ন না করে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া যাবে কিনা—এরকম অনেক বিষয়ে।

কৃষিজমিতে এ ধরনের শিল্পায়ন হলে, তা প্রকৃত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে কিনা তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে। যাঁদের মাথার ওপর জীবিকাচ্যুত হবার, বাস্তুচ্যুত হবার খাঁড়া ঝুলছে, তাঁদের ভবিষ্যত নিয়ে বহু মানুষ উদ্বিগ্ন হয়েছেন—তাঁদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হচ্ছে কি না, এসব পরিকল্পনার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা কিভাবে বিঘ্নিত হবে, খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে কী না এ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর এর কী প্রভাব পড়বে, এ রাজ্যের অন্য জায়গায়, ভারতের অন্য প্রদেশে বা পৃথিবীর অন্যত্র এ ধরণের প্রকল্পের ফল কী হয়েছে তা নিয়েও তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে।

সিঙ্গুর[১] ঃ

বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত ভাবনা চিন্তা প্রয়োজন। সিঙ্গুরের পরিচয়ও একটু নিয়ে নেওয়া দরকার।

দু-তিন দশক আগে সিঙ্গুরের যে এলাকা মটরগাড়ি কারখানার জন্য নেওয়া হচ্ছে, তার অনেকটাই বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে থাকতো। মজে যাওয়া কানাকুন্তি আর জুলকিয়া নদীর জল আর ডিভিসি জলাধারের অতিরিক্ত জল বেরোনোর রাস্তা না পেয়ে ঐ এলাকায় বন্যা ঘটাতো প্রায় প্রতি বছরই। নিম্ন দামোদর অববাহিকা পরিকল্পনার অন্তর্গত ঘিয়া-কুন্তী জলনিকাশী প্রকল্পের কাজ গত তিরিশ বছরে অর্দ্ধেকও শেষ করা হয়নি। যেটুকু হয়েছে, তাতেই ঐ এলাকার বন্যার প্রকোপ অনেকখানি কমেছে।

সিঙ্গুর দিয়ে বা তার পাশ দিয়ে পূর্বভারতের প্রধান তিনটি ন্যাশন্যাল হাইওয়ে—দিল্লি রোড, জি টি রোড আর দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ছুটে চলেছে। পূর্ব রেলের হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইন এবং হাওড়া তারকেশ্বর মেন লাইন প্রস্তাবিত এলাকার কাছ দিয়েই কাটাকুটি করে বেরিয়ে গেছে—৬/৭ কিলোমিটার দূরত্বেই রয়েছে হাওড়া বর্দ্ধমান মেন লাইন। চন্দননগর স্টেশনের পশ্চিমে বৌবাজার আর শেওড়াফুলি স্টেশনের পূর্বে শেওড়াফুলির হাট—দক্ষিণবঙ্গের দুটো বৃহৎ পাইকারি ফল-সব্জির বাজার সিঙ্গুর থেকে ৮/১০ কিলোমিটারের মধ্যেই অবস্থিত। হুগলী জেলার বিখ্যাত আলুর মোকাম রতনপুরও সিঙ্গুরে।

সিঙ্গুরের যে এলাকায় মটরগাড়ির কারখানার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেখানে গত পনের-বিশ বছরে চাষবাসেরও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে— শ্রম আর এলাকার উর্বরা দোঁআশ মাটির মেল বন্ধনে কৃষকরা লাভের মুখও দেখছিলেন। ধান, পাট, আলু—এই তিনটে মূল ফসল ছাড়াও শাক-সব্জি, সামান্য তৈল বীজ, কিছু ফলের চাষও এখানে কৃষিজ আয়ের উৎস। কৃষক পরিবারগুলির এম-এ, বি-এ পাশ ছেলেরাও চাকরি-আলেয়ার পেছনে হন্যে হয়ে ছোটা ছেড়ে অনেকেই চাষ-বাসে লেগে পড়েছিলেন। বাড়তি আয়ের সুবাদে সেচের জন্য নলকূপ বসানো বা মিনি-ট্রাক্টরও কেনার দিকেও অনেকে গেছেন।

---

১. **SINGUR : State** –West Bengal, **District**–Hooghly, **Subdivision**–Chandernagore Coordinates 22.81° N, 88.23° E
No of Mouzas 109 Area–19195 Hectare, **Population** (1991 census)–Hindu 244157+Muslim 20658 (was 30368 in 1981)+Christian 61
Elevation (Average) 14 m above sea level, Time zone IST (UTC+5:30), Males constitute 51% of the population and females 49%.
Singur has an average literacy rate of 76%, higher than the national average of 59.5%: male literacy is 81%, and female literacy is 71%. In Singur, 9% of the population is under 6 years of age.

উন্নত কৃষি-প্রযুক্তি, সার কীটনাশকের ব্যবহার, সেচের সুবিধে সব মিলিয়ে এলাকাগুলি বহু ফসলা সমৃদ্ধ কৃষিভূমিতে রূপান্তরের দিকে অনেকটাই এগিয়েছে।

সিঙ্গুরের চাষবাস ঃ

রাজ্য সরকারের প্রদত্ত তথ্য[২] থেকে দেখা যায় সিঙ্গুর ব্লকে বছরে ১০,০০১ মেট্রিক টনের মত বিভিন্ন ধরণের সার ব্যবহার হয়। কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি ওষুধ লাগে বছরে ৩০৬১.৫ মেট্রিক টন। এসব জিনিষ সরবরাহের জন্য ব্লকে রয়েছে ৩০৩টি দোকান। ব্লকের ১০,৫২৬ হেক্টর কৃষিজমির মধ্যে ৮৩% অর্থাৎ ৮৮৩০ হেক্টরই সেচ সেবিত। পশ্চিমবঙ্গে শস্য নিবিড়তার (Crop Intensity) হিসাবে হুগলী জেলার স্থান দ্বিতীয়—নদীয়ার পরেই। আবার জেলার গড় কৃষি নিবিড়তা ২১৫%-এর তুলনায় সিঙ্গুর এক ধাপ এগিয়ে—এখানকার কৃষি নিবিড়তা ২২০%। প্রধান ফসল ধান, আলু, পাট, শাকসব্জী।

সিঙ্গুরে কৃষক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্য ঃ

সিঙ্গুর এবং তার আশপাশের এলাকাগুলির কৃষক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। ১৯৪৬-৫২-র তেভাগা আন্দোলনে ডুবির ভেড়ি, বড়া-কমলাপুর এসব জায়গার নাম অমর হয়ে রয়েছে। চুঁচুড়া-চন্দননগর-শ্রীরামপুর সহ জেলার বহু অঞ্চলের কমিউনিস্ট কর্মীরা তখন তেভাগা আন্দোলনে সাহায্য করতে ঐ সব এলাকায় যাতায়াত করেছেন এবং অনেকেরই রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতে-খড়ি সিঙ্গুরের মাঠে হয়েছে। বিশিষ্ট তরজা গায়ক দুলাল রায়ের তরজা, গণকীর্তন ও পাঁচালীতে সত্তরের দশক পর্যন্ত সিঙ্গুরের কৃষক জনগণের, বিশেষ করে কৃষক রমণীদের বীরত্বগাথা সারা জেলার বামপন্থী সভা-সমিতিতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

তেভাগা আন্দোলনে ডুবির ভেড়ির ৬ জন কৃষক রমণী—পাঁচুবালা ভৌমিক, দাসীবালা মাল, পুষ্পবালা দাসী, চণ্ডীবালা পাকিড়া, মুক্তকেশী মাঝি এবং রাজকৃষ্ণের মা পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। সে সময়ও জমিদারদের লেঠেল-পাইকদের সঙ্গে পুলিশরাও কৃষকদের আক্রমণ করত। ফলে সংঘর্ষ অবিরামই ছিল। এরকম এক সংঘর্ষে কৃষক সমিতির দুই কর্মী কার্তিক ধাড়া ও গুইরাম মণ্ডল নিহত হন।[৩]

সিঙ্গুরে টাটার কারখানা—সিদ্ধান্তগ্রহণের অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঃ

এই সিঙ্গুরের ১০৯টি মৌজার মধ্যে পাঁচটি মৌজার ২৭% জমি টাটার কারখানা তৈরির জন্য ‘চূড়ান্তভাবে নির্বাচন’ করা হয়েছে। ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি

---

২. কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সহায়িকা—কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, সিঙ্গুর, হুগলী, ২০০৫
৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা—তুষার চট্টোপাধ্যায় (নবজাতক প্রকাশনী, ১৯৮৩) পৃ. ১৭৬

করে গত ১ ও ২ ডিসেম্বর বিরাট এক পুলিশ ও ক্যাডার বাহিনীর সাহায্যে দিনভর সন্ত্রাস চালিয়ে পাকা ধান, সদ্যবোনা আলুর খেত সহ ৯৯৭.১১ একর জমিতে বেড়া দিয়ে ‘অধিগ্রহণ’ করা হয়েছে।

জমি নির্বাচন এবং অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব। মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী ও সরকারী কর্তাব্যক্তিরা যা বলেছেন তা থেকে এটুকুই মাত্র বোঝা যায় যে টাটারা ঐ জমি চেয়েছে এবং সরকার সঙ্গে সঙ্গেই তা দিয়ে দিতে অঙ্গীকার করে ফেলেছেন। এই ২৬ ডিসেম্বরও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘টাটাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প পথ ছিল না।’[৪] প্রশ্ন থেকে যায়, সবকিছু জেনেও সরকার টাটাদের ঐ জমি দেখালেন কেন? তার আগে স্থানীয় মানুষদের মতামতই বা নেওয়া হলনা কেন?

অথচ সরকারের তথা বামফ্রন্টের ঘোষিত নীতি হল উন্নয়নের সমস্ত পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। ভারতের সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী অনুসারে পঞ্চায়েত স্তরেতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আইন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। আলোচনা-পরামর্শ দূরে থাক, রেডিও-টিভির খবর থেকেই সিঙ্গুরের মানুষ ১৮ মে প্রথম জানলেন, বানে ডুবে, খরা-অনাবৃষ্টিতে শুকিয়েও যে জমি তাঁদের কয়েকপুরুষ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে, মাস দুয়েক পর থেকে সে জমিতে আর তাঁদের কোনো অধিকারই থাকবে না। দেশের শাসকদের গৃহীত ও অনুসৃত ‘উন্নয়নে’র মডেলে তাঁদের মতো মানুষদের পরিবারের ছেলে মেয়েদের আর একটু উন্নততর জীবনে জায়গা হবে না ধরে নিয়েই তাঁদের ভবিষ্যত নিয়ে যেটুকু স্বপ্ন-জাল বোনা সম্ভব, তা যে এভাবে কেড়ে নেওয়া যেতে পারে, তা তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেননি। ভাগে চাষ করেন, নিজে পাঁচকাঠা জমির মালিক এমন কৃষকও ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন—যদি সে ‘পাশ করা’ লোকেদের দলে একটু ঠাঁই করে নিতে পারে—ঐ পাঁচকাঠা আর ভাগচাষের জমিটুকুর সঙ্গে তাঁর স্বপ্নও ভেঙে চুরমার হচ্ছে, ক্ষমতাশালীদের মুখ নিঃসৃত ‘দৈববাণী’র কল্যাণে। শুধু তাঁরাই নয়, সরকারের বা সরকারী দলের স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদেরও জানা ছিল না কিছুই। কোন বাধ্যবাধকতার কারণে ঘোষিত নীতি, আইন-পদ্ধতি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা না করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা কারোরই নির্দিষ্ট কিছু জানা নেই।

সিঙ্গুর ব্লকের বি.ডি.ও. অভিজিৎ মুখার্জী ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জিত মণ্ডল জুনের প্রথম দিকে এক সাক্ষাৎকারে সিঙ্গুরকে টাটারা কেন বেছে নিল তার উত্তরে দুটি কথা বলেছিলেন। তার প্রথমটি হল—টাটার মালিক বা কর্তাব্যক্তিরা দমদম বিমানবন্দরে নেমে চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সিঙ্গুর পৌঁছতে পারবে। দ্বিতীয়টি হল—সরকারী রেকর্ডে

৪. The Times of India 27 December 2006

৫. কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সহায়িকা—কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, সিঙ্গুর, হুগলী, ২০০৫

জমিটা পতিত বা এক ফসলী। বাস্তবিক ঐ জমিটি নির্বাচনের প্রধান যুক্তি এখনও এটাই। ঐ কর্তারা আরো জানিয়েছিলেন ১৯৯০ সালের পর আর কোনো সরকারী সমীক্ষা হয়নি এবং ১৯৯০-এর রেকর্ড অনুযায়ী জমিটিকে এক ফসলী বা পতিত বলে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী ১৫ বছরে টাটার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত জমিটুকুতেই ৩৫ টি অগভীর এবং ৩টি গভীর নলকূপ হয়েছে। এর বেশীরভাগই কৃষকরা নিজেদের খরচে করলেও তার জন্য সরকারকে সেচকর দেন তাঁরা—২০০৫-এর সরকারী হিসেবেই ব্লকের ৮৩% জমিতে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে।[৫] তা ছাড়া রয়েছে কুন্তী আর জুলকিয়া নদীর জল, ডিভিসির খাল দিয়ে আসা জলাধারের জল। কোনো অনভিজ্ঞ লোকও বলে দিতে পারেন, দক্ষিণবঙ্গের যে জমিতে কেবল বৃষ্টির জলে চাষ হয়, সে জমিই কেবল এক ফসলী হতে পারে। যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে অবশ্যই একাধিক ফসলের চাষ হয়।

এর মধ্যে মেধা পাটকর, মহাশ্বেতা দেবী, মলয় সেনগুপ্ত ও দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত ২৭ অক্টোবরের ‘জনশুনানি’র প্রতিবেদন সহ আরো অন্ততঃ চারটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিশনের প্রতিবেদনে এবং ঐতিহাসিক সুমিত সরকার, কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তথ্যানুসন্ধান সহ অজস্র রিপোর্ট ও প্রতিবেদনে এই মিথ্যার স্বরূপ সন্দেহাতীতভাবে উন্মোচিত হয়েছে। এর পরেও ১৩ ডিসেম্বর ‘দি হিন্দু’তে এবং ঐ সপ্তাহেই ‘পিপলস ডেমোক্র্যাসী’তে বৃন্দা কারাতের লেখা এবং ৩১ ডিসেম্বরের ‘পিপলস ডেমোক্র্যাসী’র সম্পাদকীয়তেও একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

কেন সিঙ্গুর তার উত্তরে অনেক খোঁচাখুঁচি-লেখালেখির পর পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন পর্ষদ গত ৪ ডিসেম্বর, ২০০৬ এক চিঠিতে[৬] জানিয়েছে ‘যাতায়াতের সুবিধা ও পরিকাঠামোর লভ্যতার বিচারে’ সিঙ্গুরকে নির্বাচন করা হয়েছে। টাটা মোটরের কর্তাব্যক্তিদের যাতায়াদের সুবিধার জন্য ১৫০০০ মানুষের আবাদভূমি তথা আবাসভূমি—জীবন-জীবিকার সম্বলকে কেন বলি দিতে হবে তার সদুত্তর আজও পাওয়া যায়নি। সরকার যা বলছে, তার সার কথা হল টাটারা ঐ জমি চেয়েছে এবং তা দেওয়া ছাড়া সরকারের গত্যান্তর নেই। অথচ সরকারই টাটাকে জমি দেখিয়েছে। টাটা মোটরসের প্রধান রবিকান্ত আবার সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁদের পছন্দের তালিকায় নাকি সিঙ্গুর ছিলনা।

সরকার চালাচ্ছে কারা?

সরকারের ওপর শিল্পপতিদের এই নিয়ন্ত্রণ এবং এই ‘জো হুজুর’ মনোভাব গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে আশঙ্কাজনক। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সরকার চালাচ্ছে কারা—টাটারা, তাদের মতো পুঁজিপতিগোষ্ঠী বা তাদের খুঁটি সাম্রাজ্যবাদীরাই

৬. WBIDC letter No. Adm/141/ 2006/3113 dated 4 December 2006 to President, APDR, Hooghly Dist. Committee.

কি? টাটাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া সরকারের সামনে আর কোনো রাস্তা নেই, বারবার এ কথা বলা এবং ১৮ মে'র সেই কালো দিনটির আগে সরকার বা গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার কোনো স্তরে—বিধানসভায়, মন্ত্রীসভায় এমন কি বামফ্রন্টের সভাতেও এ নিয়ে কোনো আলোচনাই না হওয়া গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভবিষ্যতের আগামী কালো দিনগুলির দিকেই ইঙ্গিত করে। আমেরিকার রেগান জমানায় অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য, বিশেষ করে জাপানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য একইভাবে সরকারের অর্থভাণ্ডার এবং অন্যান্য সঙ্গতি (Resource)-র বিশাল অংশ শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী ক্লিন্টন জমানায় শিল্পপতিরা, বিশেষত তেল শিল্পপতিগোষ্ঠী রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নিজেদের আধিপত্য সুদৃঢ় করে। বিশিষ্ট আমেরিকান বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি দেখিয়েছেন এর পরিণামে তারা তাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বুশকে দিয়ে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ ও দখল করাতে এবং মার্কিন জনগণের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনতে সমর্থ হয়।[৭]

জীবিকার অধিকার, 'উন্নয়নে'র কোনো সুফল থাকলে তাতে জনসাধারণের অধিকার, সরকারের ওপর শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদির মতো বহু বিষয়কে কেন্দ্র করে সিঙ্গুরের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে মেদিনীপুরের হরিপুর-নন্দীগ্রাম-হলদিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙ্গর-বারুইপুর—সর্বত্র এই ধরনের প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণ সংগঠিত হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। সিঙ্গুরের আদলেই দল-মত মতাদর্শ নির্বিশেষে নারী-পুরুষ এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগঠন গড়ে তুলছেন। অধিকার আন্দোলন ও অন্যান্য সামাজিক ও পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরাও এই গণআন্দোলনের অংশীদার হয়ে পড়ছেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের শুরুতে, এমনকি এই অক্টোবরের শেষ পর্যন্তও বুদ্ধিজীবীদের যে বড় অংশটি নীরব ছিলেন, পরবর্তী মাস দুয়েকের ঘটনা তাঁদেরও পক্ষ নিতে বাধ্য করেছে। সি.পি.আই.(এম), ঠিকভাবে বলতে গেলে ঐ দলের একটি ক্ষমতাধর গোষ্ঠী এবং কয়েকজন পুঁজি-বন্ধু আমলার একটি চক্র একদিকে। এইভাবে ১৮ মে'র পরবর্তী সিঙ্গুর এক ভিন্ন তাৎপর্যের সিঙ্গুর হয়ে হাজির এই মুহূর্তে।

রাজ্য বিধানসভায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছরে সরকারের শিল্পায়ন-নগরায়ন পরিকল্পনার বলি হয়েছে ১ লক্ষ একর কৃষিজমি। আগামী ৫ বছরেও উধাও হতে চলেছে আরো এক লক্ষ একর কৃষিজমি। এর ফলে সম্ভাব্য খাদ্য সংকটের বিষয়ে নিজের উদ্বেগও গোপন রাখেননি তিনি। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীও বিধানসভায় একই আশংকা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী এবং বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান

৭. Propoganda and Public Mind–Noam Chomsky, 2001, pages 17-19

অবশ্য এরকম আশংকার কথা উড়িয়ে দেন। মন্ত্রীদ্বয়ও পরে আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি—বরং রাজ্য 'খাদ্যে স্বয়ম্ভর'—কৃষিতে অগ্রগতি শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, অতএব এখন শিল্পায়ন চাই এবং তার জন্যে কৃষিজমি ব্যবহার করতেই হবে এসব কথাও বলতে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ কি খাদ্যে স্বয়ম্ভর?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস্ এ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকস্ প্রকাশিত ২০০১-০৫ সালের সাম্প্রতিকতম তথ্য থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের গড় লভ্যতার পরিমাণ ১৯৩ কেজি। প্ল্যানিং কমিশন যে মাপকাঠি ঠিক করেছে সে অনুযায়ী বেঁচে থেকে স্বাভাবিক কাজকর্ম করার জন্য একজন মানুষের বছরে ২০৯ কেজি খাদ্য প্রয়োজন। একথাও মনে রাখতে হবে ঐ বছরগুলোতে বন্যা-খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোনো শস্যহানি হয়নি। আরো মনে রাখতে হবে, সরকারি দপ্তরগুলোর হিসেবে অতিরঞ্জনের প্রাধান্য সর্বব্যাপী। অতিরঞ্জনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা নিয়ে ব্যুরো অফ্ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস্ অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকসের অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা সচ্চিদানন্দ দত্তরায় দেখিয়েছেন এই অতিরঞ্জনের মাত্রা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫০% এরও বেশি হয়।[৮]

এ সব সত্ত্বেও সরকারী হিসেবেই এ রাজ্যে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের লভ্যতা ১৬ কেজি করে কম। রাজ্যের জনসংখ্যা ৯ কোটির কাছাকাছি ধরলে বছরে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ১৪.৪ লক্ষ টন। ২০০১-০৪ সময়ে চাল জাতীয় খাদ্য আমদানীর পরিমাণ ছিল বছরে গড়ে ১৭.৮ লক্ষ টন—এই তিন বছরে খাদ্য আমদানির মাত্রা ছিল ১১ শতাংশ।[৯] সরকারের কৃষি জমি ধ্বংসের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এই ঘাটতি আরো ১০% বাড়বে। এর ফল হবে রাজ্যের পরিশ্রমী কৃষকরা তাঁদের শ্রম, এবং (তীব্র বেকারীত্বের কারণেই মূলতঃ) শিক্ষিত গ্রামীণ জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে কৃষির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে যেটুকু স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছেন, তা পুরোপুরি ধ্বংস হওয়া। স্বভাবত এর ধাক্কাটা পড়বে গরিব মানুষের ওপরই বেশি—যাঁরা তাঁদের আয়ের ৯০% এর বেশী খাদ্য কেনার জন্য ব্যয় করেন—ফলতঃ জলঙ্গী-আমলাশোলের মত অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের যে হাজার চারেক গ্রামে (মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকৃতি অনুযায়ী) সেখানে অনাহারে মৃত মানুষের মিছিল আরো লম্বা হবে।

আবার, শেষতম কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যের জনসংখ্যার ১৫% তাঁদের

৮. 'বিকল্প পরিসংখ্যানের আলোকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অগ্রগতি'-র 'সরকারী পরিসংখ্যানে অতিরঞ্জন' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯. বিকল্প পরিসংখ্যানের আলোকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অগ্রগতি—সচ্চিদানন্দ দত্তরায় পৃ ৭৪.৭৫

প্রয়োজনের তুলনায় ৭০% এরও কম খাদ্য পান। দৈনিক প্রয়োজন ২৭০০ ক্যালরি ধরে ঐ রিপোর্টে দেখানো হয়েছে রাজ্যের জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশই তাঁদের প্রয়োজনমত খাদ্য পান না।[১০] আর দৈনিক খাদ্যপ্রাপ্তির পরিমাণের হিসেবে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্তত ৬টি রাজ্যের পেছনে, এমনকি বিহার-উড়িষ্যার মত রাজ্যগুলিরও পেছনে।

এমন কি খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঝকঝকে দামি আর্ট পেপারে ছাপা পুস্তিকাতে প্রদত্ত ধারাবাহিক সাফল্য হল—এ রাজ্যে মাথাপিছু মাসিক খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ এ ১৫.২৫ কেজি থেকে কমে (সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য) ১৯৯৩-৯৪ এ দাঁড়িয়েছে ১৩.২৭ কেজি।[১১] এই ধারাবাহিক সাফল্যের ধারা পরবর্তী বছরগুলিতেও বজায় থাকলে ২০০৬ এ তা মাসিক ১২ কেজিতে দাঁড়িয়েছে আশা (আশংকা?) করা যায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের খাদ্যের অধিকার বিষয়ের বিশেষ প্রতিবেদক (Special Rapporteur on Right to Food) জাঁ জিগলার (Jean Ziegler) ২০০৬ এর ২২ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে 'ভারতে স্থায়ী ক্ষুধা ও অপুষ্টির ব্যাপকতা' (Extent of chronic Hunger and Malnutrition in India) শীর্ষক একটি প্রতিবেদন পেশ করেছেন।[১২] তার আগে তিনি ২০০৫ এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সরেজমিন তথ্যানুসন্ধান করেন। ভারতে অপুষ্টিতে জর্জরিত মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক এবং শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির মাত্রা বিশ্বের সব থেকে বেশি দেশগুলোর অন্যতম—এই তথ্যের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্যই রাষ্ট্রসংঘ ঐ তথ্যানুসন্ধান করে। ঐ রিপোর্টে দেখা যায় ঃ

১) গ্রামীণ ভারতে খাদ্য লভ্যতা ২০০৬-এ দাঁড়িয়েছে বার্ষিক মাথাপিছু ১৫২ কেজি। —এই পরিমাণ ১৯৯০ এর তুলনায় মাথাপিছু ২৩ কেজি কম।

কৃষি মজুরির নিম্নগামিতা, কৃষকদের জমি হারানোর ক্রমবর্দ্ধনশীলতা এবং খাদ্য মূল্যের উর্ধ্বগামিতা 'খাদ্যের অধিকার' থেকে গ্রামীণ মানুষকে গুরুতরভাবে বঞ্চিত করছে।

২) ভারতের অর্দ্ধেকেরও বেশি নারী ও শিশু তীব্র অপুষ্টি এবং স্থায়ী খাদ্যহীনতায় আক্রান্ত।

৩) শিশুদের ৪৭% এর ওজন কম এবং ৪৬% এর বৃদ্ধি ও বিকাশ শৈশব থেকেই ব্যাহত হয়। এটা এমনকি সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশগুলির থেকেও বেশি।

১০. ন্যাশন্যাল সার্ভে রিপোর্ট (NSS Report No. 471)

১১. কৃষির অগ্রগতি ঃ ধারাবাহিক সাফল্যের ইতিবৃত্ত—তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১

১২. The Times of India 24 September 2006

৪) পরিবারগুলির ৩০ শতাংশেরও বেশি তাদের আয়ের ৭০ শতাংশ খরচ করেও মাথাপিছু ১৭০০ ক্যালরিরও কম খাদ্যশক্তি পেতে পারে। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্যশক্তি ২১০০ ক্যালরি প্রয়োজন—আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মান অনুযায়ী।

বলাই বাহুল্য খাদ্য উৎপাদন ও লভ্যতার বিচারে দেশের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান যেখানে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তথ্যগুলির বিশেষ কোনো হেরফের হওয়া সম্ভব নয়। তেলবীজ, ডাল, আখ, মাছ-মাংস-ডিম এসব খাদ্য উপাদানের ব্যাপারে এ রাজ্যের অবস্থা কষ্ট বললেও কম বলা হয়। কৃষকদের জমি হারানোর ব্যাপারেও এ রাজ্য যে এগিয়ে রয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত 'Human Development Report' প্রদত্ত তথ্যই বলে—বছরে পাঁচলাখ করে কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। রাজ্যের ভূমি সংস্কার সচিব আরো জানিয়েছেন প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যাও বছরে বাড়ছে ৯০ হাজার করে।[১৩] আর ভারতের মত দেশগুলোর অবস্থা এরকমই হোক এটাই বর্তমানের 'একমেরু' বিশ্বের প্রভু আমেরিকা আর সাঙ্গোপাঙ্গোরা চায়।

খাদ্য সংকট তৈরির এই চেষ্টা কার স্বার্থে ?

বিশ্বে খাদ্যের বাজার চার/পাঁচটা বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের কার্টেল নিয়ন্ত্রণ করে। 'আগাম ব্যবসা' (Forward Trading)-র চালু ব্যবস্থায় চার-পাঁচ বছর পরে বিক্রয়যোগ্য যে খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে, এখন থেকেই তারা সে সবের মালিক হয়ে বসে আছে। খাদ্য সংকট দেখা দিলে খাদ্য আমদানী করতেই হবে—আর তা করতে হবে ঐ সব ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নির্দ্ধারিত শর্ত আর দামে। ৬-এর দশকের পি.এল. ৪৮০র কথা অনেকেই জানেন—তাদের দেওয়া শর্ত আর দাম শুধু খাদ্য কেনা-বেচার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বৈদেশিক নীতি, সমরসজ্জা, পারমাণবিক অস্ত্র এবং এখনকার তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী' যুক্তফ্রন্ট—সবকিছুতেই তারা ছড়ি ঘোরাতে পারবে। এক কথায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিপন্নতা আরো বাড়বে। বামফ্রন্টের নেতা বা শাসকরা এটা জানেন না বা বোঝেন না তা নয়—বরং খাতায় কলমে হিসেব ঠিক রাখার জন্যে—নিজেদের গণদরদী আন্দোলনমুখী ভাবমূর্তির স্বার্থে তথা বহির্বঙ্গে ভোটরাজনীতির স্বার্থে এ সব কথা তাঁরা বলে বা লিখে এসেছেন, এখনও লেখেন। ১৯৯৫-এ তাঁরা বলেছিলেন, "অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশকে যখন কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ইত্যাদির নামে সার্বভৌমত্ব, স্বয়ম্ভরতা ও স্বনির্ভরশীলতা বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হচ্ছে, ঠিক তখনই পঞ্চায়েতগুলিকে জনগণের স্বনির্ভর, স্বয়ম্ভর ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উপদেশ বিতরণ করা হচ্ছে। বিবেকহীন বাজারসর্বস্বতা বহু দশকব্যাপী ভূমিসংস্কারের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত সাফল্যগুলিকে উলটে দিতে উদ্যত হয়েছে। এগুলি কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়। এগুলি হল বাস্তব চ্যালেঞ্জ যা আত্মবিশ্বাস নিয়ে আগামীদিনে

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা—২৬ মে, ২০০৬

মোকাবিলা করতে হবে। ক্রয়ক্ষমতা থেকে ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষের কাছে খোলাবাজারের কচকচানি মূল্যহীন। তা ছাড়া দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং এই দুনিয়ার সমস্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ইত্যাদি বিষয়গুলি এখনো খোলাবাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।"[১৪] সি পি আই (এম)-এর বিগত পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে তাঁরা ভারতবর্ষের মত দেশে কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসের এবং তার মাধ্যমে খাদ্য সংকট তৈরী করে দেশকে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত খাদ্য ব্যবসার বাজারে পরিণত করার চেষ্টার ব্যাপারে মানুষকে সতর্কও করে দিয়েছেন। (পৃঃ ১৮, ২ নং অনুচ্ছেদ) আর পশ্চিমবঙ্গে ঠিক সেই সেই কাজগুলিও পরম বিশ্বস্ততা ও চরম বল্গাহীনতার মাধ্যমেই করছেন। তাই সিঙ্গুরের কৃষিজমিতে টাটার মোটরগাড়ি কারখানা গড়ার প্রস্তাব না ভেবেচিন্তে হঠাৎ করা হঠকারিতা নয় বলে যাঁরা বলছেন, তাঁরা বেঠিক নন—সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের স্বার্থে নয়া উদারবাদীদের সুচিন্তিত পরিকল্পনারই অংশ এটা। বিশ্বায়নের এই পরিকল্পনা মানুষের জীবন ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের স্বীকৃত অধিকারকে খর্ব করছে। পুঁজির বিকাশের একমাত্র উদ্দেশ্যই আরো মুনাফা করা—পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন আরো মুনাফার পথ প্রশস্ত করে। এইভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমস্ত মানুষের অধিকারের মানবাধিকার স্বীকৃত নীতিকেও লঙ্ঘন করে, লঙ্ঘন করে ভারতের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত সাধারণের কল্যাণের জন্য সম্পদের সমবন্টনের নীতিকেও।

পশ্চিমবঙ্গ কি কৃষি উৎপাদন বিকাশের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে?

রাজ্য সরকারের ১৯৯৯-২০০০ সালের কৃষিনীতির খসড়াতেই বলা আছে সামগ্রিক খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার কমে আসছে এবং সর্বোপরি খাদ্যশস্য চাষে গতিবৃদ্ধির হারও কমে আসছে। মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন এখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বছরের স্তরে পৌঁছয়নি—এমনকি বামফ্রন্ট শাসন শুরুর আগের বছর—১৯৭৬ সালের স্তরেও পৌঁছয়নি। সরকারি তথ্য থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হেক্টরে ধানের উৎপাদনশীলতা (২২৩৭ কেজি) ভারতেরই অন্ততঃ পাঁচটি রাজ্য—অন্ধ্র (২৬৮৭ কেজি), পাঞ্জাব (৩৩৪৬ কেজি), হরিয়ানা (২৭২৪ কেজি), তামিলনাড়ু (৩২৭৮ কেজি), কর্ণাটক (২৫১২ কেজি) এর পেছনে।[১৫] এই কম উৎপাদনশীলতার একটি প্রধান কারণ সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা—পর পর ৬টি বামফ্রন্ট সরকার এই মূল কারণটিকে চিহ্নিত করেছে নির্বাচনী ইস্তাহারে অন্যান্য সরকারী প্রকাশনায়, প্রতিশ্রুতির তালিকায় লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করেছে এবং যথারীতি তা ভুলে গেছে। পরিণামে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষিজমিই এখনো সেচের আওতার বাইরে। এটা স্বীকার করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে সেচের

১৪. গ্রাম উন্নয়নের সতের বছর—তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৫।
১৫. রাজ্য সরকারের ২০০৪-০৫ সালের প্রাক বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং কৃষির অগ্রগতি ঃ ধারাবাহিক সাফল্যের ইতিবৃত্ত—তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, প.ব সরকার, ২০০১।

সুযোগ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় 'অপ্রতুল'।[১৬]

এতো সব তথ্য (এবং বেশ কিছুটা অতিরঞ্জন সহ) নিজেদের প্রকাশিত বইপত্রে থাকলেও ২০০৬ এর মে মাসে তাঁদের চৈতন্যোদয় হল যে পশ্চিমবঙ্গে 'কৃষি উৎপাদনশীলতা' চরমতম স্তরে, শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। পৃথিবীর সবদেশের অভিজ্ঞতা এবং কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত 'বুর্জোয়া' বা 'মার্কসবাদী' তত্ব সাধারণভাবে এটা স্বীকার করে যে ভূমি সংস্কারই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত। ভূমি সংস্কার চালিয়ে যেতে গেলে সামন্ততন্ত্রের যে অবশেষকে আঘাত করতে হয়, সেটাই বর্তমানে বামফ্রন্টের ভোট রাজনীতির পেশীশক্তি ও ক্ষমতার প্রধান উৎস বলেই ভূমি সংস্কারে সরকার একেবারেই অনাগ্রহী। পরিণামে গত ৩০ বছরে মাত্র ৭% জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা গেছে এবং কেবলমাত্র গত ৫ বছরেই ২৫ লক্ষ কৃষক ভূমিহীন হয়েছেন, জমি বেচে দিতে বাধ্য হয়ে বছরে ৯০ হাজার ছোট ও মধ্যচাষী প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হচ্ছেন।[১৭] তাই পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনশীলতা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে এটা একটা ডাহা মিথ্যা। বাস্তব হল, কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার করতে অনাগ্রহ, কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সহায়তা দিতে সরকারের অপরাধমূলক ব্যর্থতা। কৃষিতে সামন্ত সম্পর্কের উপস্থিতি গণতন্ত্রের বিকাশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করছে। আর এসবকে আড়াল করার জন্যই 'শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের' ধূয়া তোলা হচ্ছে।

ভূমি সংস্কারের অসম্পূর্ণতা তথা ব্যর্থতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মূল্যায়নের জন্য নিযুক্ত কমিটির ১৯৯৩ সালে পেশ করা রিপোর্টে খোলাখুলিই স্বীকার করা হয়েছে—'ভূমি সংস্কার কর্মসূচী এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৯২-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১১ বছরে বন্টিত জমির পরিমাণ মাত্র ৯৪,০০০ একর। এই হারে ভূমি সংস্কার চালালে সরকারের হাতে থাকা ২.৫ লক্ষ একর খাস জমি বিলি করতে আরো ৩০ বছর লাগবে।'[১৮] উল্লেখ্য জমিদারী নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৫৩) অনুসারে জমি উদ্ধার ও বন্টনের কাজের অর্দ্ধেকেরও বেশি ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৭৭-এর আগে বণ্টিত জমির পরিমাণ ২৫৩৫৫৬ হেক্টর, ১৯৭৭ থেকে ২০০৩ সময়কালে এই পরিমাণটা হল ১৮৬০২৯৪ হেক্টর।[১৯] সরকার উদ্ধার করতে পারেনি এমন বহু জমি কৃষকরা সংগঠিতভাবে দখল করে নিয়েছিলেন, বিশেষ করে

১৬ কৃষির অগ্রগতি ঃ ধারাবাহিক সাফল্যের ইতিবৃত্ত—তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর, প.ব. সরকার,
১৭. আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬/৫/০৬
১৮. Quoted in EPW Commentary October 16, 2004 Land Acquisition in a West Bengal District by Abhijit Guha
১৯. Economic Review, 2003-04., Govt. of WestBengal

১৯৬৭-র পরবর্তী সময়ে। ৬৭-৭২ পর্যায়ে নক্সালপন্থী আন্দোলন পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের প্রভাব অনেকাংশেই খর্ব করেছিল এবং ঐ পর্যায়ের পর জমিদারদের লেঠেল-পাইক বাহিনীর কার্যকর অস্তিত্বও বেশির ভাগ জায়গাতেই ছিল না। বে-আইনী জমি উদ্ধার ও তা বন্টনের সরকারী দায়িত্ব কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে করলেও তার সরকারি স্বীকৃতির দায়িত্ব বামফ্রন্ট পালন করেননি। ২৪ পরগণার ভাঙ্গরের মতো কোথাও কোথাও ভাগচাষী ও খেতমজুরদের এরকম দখল করা জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করে প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত ১৯৯০-এর আগে পর্যন্ত জমি উদ্ধারে না হলেও বন্টনে যেটুকু আগ্রহ বামফ্রন্টের ছিল, তা তাঁদের নিজেদের উপলব্ধি মতই পপ্যুলিষ্ট কর্মসূচী। এর পর থেকে সি পি আই (এম)-এর শীর্ষ নেতারা বহু জায়গাতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একথা বলেছেন তাঁদের দীর্ঘদিন (মতায় থাকতে হবে, এটা তাঁরা আগে বুঝতে পারেননি, তাই দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার বদলে পপ্যুলিষ্ট কাজ করে গেছেন—এরপর থেকে তাঁদের দায়িত্বশীল হতে হবে। তাই সরকারি হিসেবেই সিঙ্গুরেও দেখা যায় নথিভুক্ত বর্গাদারের দু'গুণ অনথিভুক্ত বর্গাদার। খবরের কাগজে রীতিমতো ছবি ছাপিয়ে জমিদারী বিলোপ আইনের উর্দ্ধসীমার অনেক বেশি জমি টাটার কারখানার জন্য প্রশাসনকে দেবার 'স্বেচ্ছা প্রতিশ্রুতি' দিচ্ছেন এক সরকার সমর্থক তাও দেখা যায়।[২০]

কৃষি জমি ছাড়া কি শিল্পায়ন সম্ভব নয়?

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নই এই মুহূর্তে সব থেকে জরুরী। আর শিল্পায়ন করতে হলে কৃষি জমির ধ্বংস সাধন করতেই হবে—এটাই সিঙ্গুরে কৃষিজমি ধ্বংসের সপক্ষে সরকার ও সি পি আই (এম) দলের প্রধান যুক্তি। শিল্পায়নই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য এই মুহূর্তের একমাত্র বা প্রধান কাজ কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে এবং যে সব সিদ্ধান্তের (যেমন—কৃষি উৎপাদন শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, ভূমি সংস্কারের কাজ শেষ) ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে তার ভিত্তিই নড়বড়ে। সে আলোচনায় বিস্তৃত প্রবেশ না করে, যদি তর্কের খাতিরে একথা ধরেও নেওয়া হয় শিল্পায়নই প্রধান কাজ, সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠতে পারে—কেমন শিল্প? বামফ্রন্টের শিল্পনীতিতে তো বলা ছিল—জোর দেওয়া হবে ছোট ও মাঝারী শিল্পে, জোর দেওয়া হবে কৃষিভিত্তিক শিল্পে, কর্মসংস্থানে। টাটার মোটর গাড়ি শিল্পের প্রস্তাব এ সব নীতিকে মেনে চলছে কিনা—এ প্রসঙ্গও আপাততঃ মূলতুবী থাক। সিঙ্গুরের কৃষিজমি নিয়ে নেবার প্রসঙ্গে যেটা বলা হচ্ছে যে, কৃষিজমি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন সম্ভব নয়, সে দাবির যথার্থতা অবশ্যই ভাবতে হবে।

২০. The Telegraph, 28 July 2006

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'Statistical Hand Book'-এর সর্বশেষ সংস্করণ (২০০৫) -এ কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকা বাদে জমি সম্পর্কে নীচের তথ্যগুলো রয়েছে ঃ

মোট জমি—	৮৬৮৭৫২১ হেক্টর	১০০%	(৮৬৮৭৫৪০ হেক্টর)
চাষযোগ্য নয় এমন—	১৬৩৬০৩৮ হেক্টর	১৮.৮%	
মোট কর্ষিত এলাকা—	৫৪২৭৬৭২ হেক্টর	৬২.৫%	(৫৪৬৩৬৭০ হেক্টর)
বর্তমান পতিত জমি—	৩৩৩৩৭২ হেক্টর	৩.৮%	(৩৩৩৩৮০ হেক্টর)
বর্তমান পতিত বাদে অন্যান্য অকর্ষিত জমি—	১১৯১৪৬ হেক্টর	১.৪%	
বনাঞ্চল—	১১৭১২৯৩ হেক্টর	১৩.৫%	(১১৭১৩১০ হেক্টর)

ডিসেম্বর ২০০৬-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৩-০৪ এর যে Status of Land প্রকাশ করেছেন তাতে প্রদত্ত হিসেব ব্র্যাকেটে দেওয়া হল। একই বছরের হিসেবে এই গরমিল কেন, জানা নেই। তবে হিসেব থেকে যা দেখা যাচ্ছে তা হল পতিত জমির পরিমাণ মোট কর্ষিত জমির পরিমাণের ৬% এরও বেশী এবং মোট জমির পরিমাণের ৩.৮৫%—পরিমাণ হিসেবে পতিত জমির পরিমাণ খুব কম একটা কিছু নয়। উপরোক্ত সরকারী হিসেবে বর্তমান পতিত এবং বর্তমান পতিত বাদে অন্য অকর্ষিত জমি রয়েছে ৪৫২৫১৮ হেক্টর অর্থাৎ ১০ লক্ষ একরেরও বেশী। টাটাদের মটরগাড়ি প্রকল্পের জন্য যা জমি লাগবে তার হাজার গুণেরও বেশী। ৫ বছরে ১ লক্ষ একর হারে জমি শিল্পায়নের জন্য ব্যবহার করা হলে কৃষিজমি বা বনাঞ্চল এক ইঞ্চি ব্যবহার না করেও আঙ্কিক হিসাবেই ৫০ বছর 'শিল্পায়ন' চালিয়ে যাওয়া যায়। যাবেনা তার প্রধান কারণ 'সিঙ্গুর' বা তার মত শস্য-শ্যামলা বালিকাগুলিকেই টাটা-সালেম নামক রাজা-মহারাজের পছন্দ। আর তাদের পছন্দই আজকের 'উন্নয়নে'র শেষ কথা।

অথচ সরকারের, এমন কি এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত, গেজেট প্রকাশিত নীতি হল কৃষিজমিকে শিল্পায়ন-নগরায়নের কাজে ব্যবহার না করা। ২০০০ সালে গৃহীত এবং ২০০৪ এ সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের জমি অধিগ্রহণ নীতিতে এটা জোর দিয়েই বলা হয়েছে। স্বামীনাথন কমিটির ৪ অক্টোবর ২০০৬-এ পেশ করা 'সংশোধিত জাতীয় কৃষিনীতি'-তে বলা হয়েছে 'কৃষিজমিকে অবশ্যই কৃষিকাজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং কৃষি নয় এমন কাজে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তরিত করা চলবে না।'[২১] গত বছরের শেষদিকে সি.পি.আই.(এম) সহ বামদলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেছে, তাতেও SEZ এর জন্য কৃষিজমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর দাবি জানানো হয়েছে।[২২]

২১. Fifth and final Report on National Policy for Farmers Para 1.4.2.3

২২. October 19, 2006 Left Parties Note to UPA on SEZ

পশ্চিমবঙ্গের এদিক-ওদিক যাতায়াত যাঁদের আছে বা এ রাজ্যের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে যাঁরা সামান্য অবহিত তাঁরাই জানেন বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-পু(লিয়া এবং বর্দ্ধমান-বীরভূমে চাষ অযোগ্য জমি মাইলের পর মাইল অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও এরকম জমি অঢেল। নতুন শিল্পস্থাপনের জন্য এসব জমি কেন ব্যবহার করা যাবেনা তার কোনো যুক্তি(সঙ্গত জবাবই নেই।

এ সব ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত শহর-শিল্পাঞ্চলে কালো বিন্দুর মত পড়ে রয়েছে বন্ধ কারখানাগুলির ভাঙাচোরা অসংখ্য শেড। ছোট বড় মিলিয়ে সংখ্যা ৬৫০০০ এর মত। সরকারী হিসেবেই জমির পরিমাণ ২০০৩ এর সমী(া অনুযায়ী ৪১০৭৮ একর। শিল্পমন্ত্রী নি(পম সেন ১৩ ডিসেম্বর তাঁর দল প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ সিঙ্গুর ও শিল্পায়ন' এ একটি নিবন্ধে বন্ধ কলকারখানার জমি শিল্পায়নে ব্যবহারে অনেক অসুবিধার কথা বলেছেন। কিন্তু এসব অসুবিধা থাকা সত্বেও বেণী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা বা স্মল টুলস কারখানার জমি প্রোমোটারিতে তো ব্যবহার করা গেছে—তা হলে শিল্পায়নে ব্যবহার কেন করা যাবে না—তার যুক্তি(গ্রাহ্য জবাব নেই। সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ১৮৯৪-র যে আইনবলে নেওয়া হচ্ছে সেই আইনে তো বন্ধ কলকারখানার ফেলে রাখা এসব জমি অধিগ্রহণ করার কোনো বাধাই থাকার কথা নয়। রাষ্ট্রের হাতে থাকা সব রকম শক্তি(নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমাজের দুর্বলতর মানুষের যেটুকু অধিকার আছে বা ছিল তা কেড়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে নি(পম বাবু যে সব অসুবিধার কথা বলেছেন, যে সব যুক্তি(দিয়েছেন, তার কোনোটাই ধোপে টেঁকে না। অসুবিধার থেকেও বড় কথা হল সদিচ্ছা এবং উদ্দেশ্য। এ দুটোই যে অনুপস্থিত তার অনেক উদাহরণই রয়েছে।

শ্রীরামপুরের নির্বাচিত সাংসদ এবং হুগলী জেলা সিটুর সভাপতি শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় ১৪ জুন, ২০০৬ হুগলীর জেলাশাসককে সিটুর প(থেকে একটি স্মারকলিপি দিয়ে জানিয়েছিলেন, হুগলীর হিন্দমোটর কর্তৃপ(প্রায় ৫০০ একর জমি ১৯৪৮ সাল থেকে বিনা ব্যবহারে ফেলে রেখেছে। ১৯৪৮-এ বিড়লাদের ২৫০ একর একেবারে বিনামূল্যে এবং বাকিটা জলের দামে মিলিয়ে ৭৪৪ একর জমি সরকার দিয়েছিল মোটরগাড়ি কারখানা তৈরীর জন্য। এক সময় ঐ কারখানায় ২২০০০ শ্রমিক কাজ করতেন। মোটরগাড়ির প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত যন্ত্রাংশই ঐ কারখানায় উৎপাদিত হতো। এর জন্যে কোম্পানী তার কারখানা, অফিস, স্কুল, কোয়ার্টার, হল, হাসপাতাল সব মিলিয়ে ২৫২ একর জমি ব্যবহার করতে পেরেছিল। বাকী জমি অধিগ্রহণ করে শিল্পায়নে ব্যবহার করা হোক—এই দাবী তোলা হয়েছিল ঐ স্মারকপত্রে। স্মারকপত্রে এও দাবি করা হয়েছিল—ঐ জমিতে প্রোমোটারি করার জন্য যেন বিড়লাদের অনুমতি না দেওয়া হয়।[২৩]

২৩. গণশক্তি(১৫ জুন ২০০৬, স্মারকলিপির পূর্ণ বয়ান দোলা সেন সম্পাদিত 'কানোরিয়ার পর সিঙ্গুর'-এ রয়েছে।

পরে 'গণশক্তি(' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধেও তিনি এসব বক্ত(ব্য তুলে ধরেন। তাঁদের দাবীপত্র পাবার পর রাজ্য মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নেয় ঐ জমিতে আই-টি পার্ক ও প্রোমোটারি ব্যবসার জন্য বিড়লাকে অনুমতি দেওয়া হল! কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সিঙ্গুরের যা দূরত্ব, ঐ জমির দূরত্ব তার থেকে প্রায় ২০ কিমি কম হবে।—সুতরাং অসুবিধা, আইনগত জটিলতা যা থাকুক না কেন মূল সমস্যা—উদ্দেশ্যের, সদিচ্ছার।

কৃষিজমি নিয়ে নিয়েও ব্যবহার না করার বা অপব্যবহার করার অজস্র উদাহরণ রয়েছে কল্যাণী, দুর্গাপুর সহ সারা পশ্চিমবঙ্গেই। খড়্গপুরে টাটা মেটালিক্সের পিগ আয়রন কারখানার জন্য ওয়েষ্টবেঙ্গল ল্যাণ্ড (রিক্যুইজিশন অ্যাণ্ড অ্যাক্যুইজিশন) অ্যাক্ট ১৯৪৮ অনুসারে ২১২.৭৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কাছাকাছিই বহু অনাবাদী জমি থাকা সত্বেও খড়গপুর ১ নং ব্লকের ৬টি মৌজার এক ফসলী জমিগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। একর প্রতি জমির মালিকের জন্য ২০,৬৮৬ টাকা এবং নথিভুক্ত(বর্গাদার থাকলে তাঁর জন্য ১১,২১১ টাকা (তিপূরণ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সংলগ্ন অঞ্চলেই বিড়লাদের সেঞ্চুরী কটন ইণ্ডাস্ট্রীর আর একটি পিগ আয়রণ কারখানার জন্য ১৯৯৬ সালে ৫২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়—সে জমি আজো পড়ে আছে। বিদ্যাসাগর বি(বিদ্যালয়ের রীডার অভিজিত গুহ তাঁর নিবন্ধ ও সা(াৎকারে উল্লেখ করেছেন, কাছাকাছি রেল লাইনের অপর পারেই প্রচুর পরিমাণে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে। সেখানে সেচ বা ভূনিম্নস্থ জলের সুবিধাও কম। অথচ ঐ এলাকায় চারটি প্রকল্পের জন্য সরকার আবাদী জমিগুলোকেই বেছে নিয়েছে।[২৪]

চন্দননগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় '৮৫-৮৬ সালে আধুনিক সিউয়েজ সিস্টেমের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য বিরাট পরিমাণ অত্যন্ত উর্বরা জমি নেওয়া হয়। 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে'র অধীনে সে সময় চুঁচুড়া-চন্দননগর ও আশপাশের সমস্ত রাস্তায় মাটির তলায় পাইপ বসানো হয়। বলা হয়েছিল, সমস্ত বাড়ির স্যানিটারি পায়খানার দূষিত জল ঐ পাইপে করে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে আসবে। সেখানে শোধনের পর কঠিন অবশেষ সার হিসেবে এবং জল সেচের কাজে ব্যবহার হবে। এর জন্য বেশ কয়েকটি পাম্পিং স্টেশনও তৈরী হয়েছিল। এ সব কাজে তিন-চারশো কোটি টাকা নয়-ছয় করে শেষ পর্যন্ত ঐ সিউয়েজ সিস্টেমের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের বিশাল জমিতে বিনোদন কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। তার কন্ট্রাক্ট ইত্যাদিতে সি পি আই (এম) ঘনিষ্ঠ কয়েকজন 'উপকৃত' ও হয়েছেন। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে যে নির্দিষ্ট কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে, সেই কাজে ব্যবহার করা না হলে মালিকদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। সং(-ষ্ট মালিকরা এ নিয়ে সরকারের কাছে দাবিও জানিয়েছিলেন। যথারীতি সরকার সেসবে কর্ণপাত করেননি। (তিগ্রস্তরা অনেকে প্রতিশ্রুতিমত (তিপূরণও পাননি।

২৪. EPW Oct 16, 2004 Land Acquisition in a West Bengal District Abhijit Guha

কালো চুক্তিসুলভ গোপনীয়তা ঃ

সিঙ্গুর নিয়ে বিতর্ক শুরু হবার সাতমাস পরেও, সরকারী মতে জমি অধিগ্রহণ পর্ব শেষ হবার ২ মাস পরেও—আজও কেউই জানেন না আইন ও বিধিমত ঐ জমি বাবদ দেয় দাম টাটারা দিয়েছে কিনা, বা তা তারা আদৌ দেবে কিনা। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে এবং সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে যাওয়া কাগজপত্র থেকে প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় টাটারা জমির জন্য এক পয়সা দামও দিচ্ছে না। WBIDC তাদের ৪ ডিসেম্বর ২০০৬-এর চিঠিতে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে টাটারা জমির দাম দিয়েছে কিনা, তা তারা বলবেন না কারণ তাতে টাটার 'বাণিজ্যিক স্বার্থ' ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।[২৫] গরীব করদাতাদের পয়সায় গায়ের জোরে জমি অধিগ্রহণ করে তা মহাকোটিপতি ব্যবসায়ীদের উপহার দেবেন সরকার, আর নাগরিককে সে কথা জানতেও দেওয়া হবে না মহাকোটিপতিদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য—স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার এক নতুন নজির নিশ্চয়ই স্থাপন করছেন বামফ্রন্ট সরকার।

টাটার সঙ্গে সরকারের বোঝাপড়া বা চুক্তি সম্পর্কে কোনো কিছু জানার অধিকারও সরকার টাটাদের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার কালো পাথরের দেওয়ালে প্রতিহত করছেন। কারখানার জন্য টাটাদের কি কি সুবিধা দিচ্ছেন তাও স্পষ্ট বা নির্দিষ্টভাবে জানার উপায় নেই, যেটুকু জানা গেছে তাতে অনুমান এরকম সুযোগ সুবিধার মোট অর্থমূল্য ১৫০০ কোটি টাকা ছুঁতে পারে। টাটাদের ১০০০ কোটি টাকা লগ্নী—ট্যাক্স দাতাদের ১৫০০ কোটি টাকার উপঢৌকন, ১৫০০০ মানুষের কর্মচ্যুতি, ১০০০ একর কৃষিজমি ধ্বংস—টাটাদের শস্তার মটরগাড়ি বাস্তবিকই খুবই শস্তা সন্দেহ নেই!! জানা গেছে সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনিক সার্কুলার জারী করে এই সব শিল্পপতিদের ১ টাকা ইউনিট দরে বিদ্যুৎ, জমি রেজিস্ট্রেশনের খরচ প্রায় বিনামূল্যে, ভ্যাট, অন্তঃশুল্ক সহ প্রায় সবরকম করেই ছাড় এর ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রেখেছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের তৈরী আইনই অধিগ্রহণের মূল অস্ত্র—উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে উপনিবেশিক আধিপত্যের ধারণার গাঁটছড়া ঃ

সিঙ্গুর এবং ২০০২ এর পরবর্তীকালে সমস্ত জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৮৯৪ সালের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের তৈরী 'জমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪' প্রয়োগ করছে। জমি-হাঙরদের পরামর্শে এবং ঐ সময় থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে জমি কব্জা করার যে অভিযান শুরু হয়, তার ঢেউ ভারতেও আসতে শুরু করায় ১৯৯৪ সালে ঐ আইনকে সংশোধন করে নেওয়া হয়—'উন্নয়নে'র আধুনিক মডেল বিশ্বায়নের প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং ঔপনিবেশিক ভাবধারার যথার্থ মেলবন্ধন এভাবেই ঘটলো। এর

২৫. WBIDC letter No. Adm/141/ 2006/3113 dated 4 December 2006

আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য একটি আইন (WB Land Requisition and Acquisition Act 1948) ব্যবহার করছিল। ১৯৯৩-এ ঐ আইনটি মেয়াদ উত্তীর্ণ (Lapse) হয়ে যেতে দেওয়া হয়। ১৯৯৪-এ যখন ব্রিটিশ আইনটিকে নতুন সাজে হাজির করা হল, তার তাৎপর্য অনেকেই ধরতে পারেন নি। যত দূর মনে পড়ে, সম্ভবতঃ মহাশ্বেতা দেবীই একটি এক পৃষ্ঠার আলোচনায় বিপদটিকে সামনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৯৪, মানে যে সময় ব্রিটিশরা চটকল তৈরী ও রেল লাইন পাতার জন্যে বিপুল পরিমাণে উন্নত জমি কেড়ে নিতে চাইছিল, সে সময়েও ঐ আইনটি 'জনস্বার্থ' নামক শব্দটির আড়ালেই তৈরী হয়েছিল। জনস্বার্থ অর্থই হল যার সঙ্গে বহু সংখ্যক মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে—স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বলে, হাসপাতাল, রাস্তা, স্কুল ইত্যাদির মতো প্রয়োজনই জনস্বার্থ। ১৯৯৪এর সংশোধনীতে 'জনস্বার্থ'কে ব্যাখ্যাত করে তার সঙ্গে কোম্পানী আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী কোম্পানী বলা যায় এমনদের প্রয়োজনকেও 'জনস্বার্থে'র অন্তর্ভুক্ত করা হল। পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার তার বর্তমানের ঘোষিত প্রিয়তম মিত্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষায় এই আইনকেই সব থেকে সুবিধাজনক ও 'ডু-ইট নাউ' কর্মপন্থার পক্ষে সব থেকে উপযোগী বলে মনে করলো।

সি পি আই (এম) দলের স্বভাবসিদ্ধ দ্বিচারিতা এখানেও উপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে ১৮৯৪-র আইনটিই তাদের জমি সংক্রান্ত বহু জনবিরোধী নীতির প্রধান হাতিয়ার হলেও এ রাজ্যের বাইরে, যেখানে তারা ক্ষমতায় নেই সেখানে কিম্বা তাদের সর্বভারতীয় মুখপত্রে তারা এই ঔপনিবেশিক আইন বাতিলের দাবিতে মুখর ও সোচ্চার।

উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে উপনিবেশিক আধিপত্যের ধারণার এ এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। এই মেলবন্ধন গণতন্ত্র ও উন্নত জীবনের জন্য সংগ্রামে মানুষের এতাবৎ কালে অর্জিত ও স্বীকৃত অধিকারগুলো নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ভারতের সংবিধানের ২১ নং ধারায় যে জীবনের অধিকারের কথা বলা আছে, পরবর্তী কালে সুপ্রীম কোর্টে ও বিভিন্ন হাইকোর্টের একাধিক রায়ে তাকে সম্প্রসারিত করে মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন (dignified life), খাদ্য-আশ্রয়-স্বাস্থ্যের অধিকারের সঙ্গে সমার্থক করার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে গৃহীত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৩(১) নং অনুচ্ছেদে স্বীকৃত জীবনের অধিকার একইভাবে পরবর্তীকালে 'রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদে' মর্যাদা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ১৯(১)(g) অনুচ্ছেদে নাগরিকের নিজের পছন্দমত জীবিকার্জনের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং ৩৯ নং অনুচ্ছেদে জীবিকার্জনের উপায়ের উপর অধিকারের তথা সাধারণের কল্যাণের জন্য সম্পদের বন্টনের নীতি স্বীকার করা হয়েছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের (১৯৪৮) ১৭ নং অনুচ্ছেদেও সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত। ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(f) এবং

৩১ নং অনুচ্ছেদে সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে জনস্বার্থে আইন মোতাবেক রাষ্ট্রকে তা অধিগ্রহণের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯(১)(f) এবং ৩১ নং অনুচ্ছেদ দুটি বাদ দেওয়ার ফলে সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার রইলো না। অবশ্য সংবিধানের ৩০০A অনুচ্ছেদে সম্পত্তির অধিকারকে একটি সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে আইনী কর্তৃত্ব ছাড়া কাউকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। দেশের আইন, সংবিধান ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী মানুষের জীবনের, মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের, জীবিকার্জনের তথা জীবিকার্জনের উপায়ে (means) অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত। উল্লেখ্য, ভারতের সংবিধানে জীবনের অধিকার মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করেও রাষ্ট্রকে যেভাবে 'আইনসম্মত উপায়ে' মানুষকে খুন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, একই ভাবে সম্পত্তির অধিকারকে একটি সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের আইনী কর্তৃত্বের (authority of law) দ্বারা নাগরিককে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থাও আছে। ১৮৯৪ সালের ব্রিটিশ আইনটিকে ১৯৯৪ সালে সংশোধন করে জনস্বার্থের সঙ্গে কোনো কোম্পানীর স্বার্থকে একাকার করে দিয়ে এক কোপে এই সমস্ত অধিকারই কেড়ে নেওয়া হয়েছে—একই সঙ্গে ৩৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সাধারণের কল্যাণে সম্পদের বন্টনের নীতিকেও বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। ১৯(১)(f) এবং ৩১ নং অনুচ্ছেদ দুটি বাদ দেওয়ার যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিল, সংবিধানের মুখবন্ধে রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করার ফলে সম্পত্তির অধিকারের আর কোনো প্রয়োজন থাকছে না। বলাই বাহুল্য সংবিধানের মুখবন্ধে যে 'সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে'র কথা বলা হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন—সমাজতন্ত্র নয়, তারা পুঁজিবাদকেই আদর্শ হিসেবে নিয়েছে।

১৮৯৪ এর আইনটিতে ব্যবহৃত 'জনস্বার্থ' শব্দটি খুব সুনির্দিষ্ট না হলেও একেবারে অস্পষ্টও ছিল না। বর্তমানে এই আইন অনুসারে সিঙ্গুর সহ সর্বত্র জমি অধিগ্রহণের জন্য নোটিশে সরকার যে শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছেন, তা হল 'জনস্বার্থ অর্থাৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন'। শেষ শব্দবন্ধদুটি খুবই অনির্দিষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর। টাটার কারখানায় ৮০০ (এবং শেষ পর্যন্ত ২০০০) লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং অন্ততঃ ১৫০০০ মানুষ জীবিকাচ্যুত হবেন—একে কোন হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি বলা যাবে? টাটার মোটরগাড়ি কারখানায় যে সম্পদ সৃষ্টি হবে তার লাভ তো টাটারাই পাবে—ভারতের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশমতো সাধারণের কল্যাণে সম্পদের বন্টন তো হবে না, কারণ সরকার পুঁজিবাদের পথে চলবে এবং টাটারা কারখানা করলে করবে মুনাফা করার জন্যই, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তার অ্যাজেণ্ডাতেই নেই।

যদি এ রকম কারখানা করার ফলে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হতো, তাহলে জামশেদপুরে টাটার কারখানা প্রায় একশো বছর থাকার পরেও ঝাড়খণ্ড রাজ্য ভারতের দরিদ্রতম রাজ্যগুলির অন্যতম হয়ে থাকতোনা কিম্বা উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে 'উন্নয়নে'র 'সুফলে'র প্রাপ্য দাবি করতে গিয়ে আদিবাসীদের গুলি খেয়ে মরতে হতনা।

আবার জমি অধিগ্রহণের নোটিশে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, অধিগ্রহণ হবে সরকারী কোষাগারের টাকায়। জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় টাটা কোম্পানীর কারখানা তৈরীর জন্যে জমি কিনে দেওয়া অবশ্যই আইনবিরুদ্ধ কাজ। গত কয়েক বছর থেকে মানুষকে খাবার জল পর্যন্ত কিনতে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সরকারের পালনীয় যাবতীয় সামাজিক দায়িত্বের জন্য দাম দিতে বাধ্য করে সংগৃহীত টাকায় করা এই কাজ চরম জনবিরোধী ও সবরকমের নীতি-আদর্শের বিরোধীও বটে।

আইনী প্রতিকার পাবার পথও রুদ্ধ ঃ

এমন কি জনস্বার্থ লঙ্ঘিত হচ্ছে, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় টাটা কোম্পানীর কারখানা তৈরীর জন্যে জমি কিনে দেওয়া আইনবিরুদ্ধ এ সব অভিযোগে আদালতের কাছ থেকে কোনো সুবিচার পাবার আশা প্রায় নেই বললেই চলে। অধিগ্রহণের নোটিশেই বলে দেওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র যাঁদের জমি নেওয়া হচ্ছে তাঁরা আপত্তি জানাতে পারেন—তা-ও কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে এবং সে ক্ষেত্রেও অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই যে চূড়ান্ত এ-ও বলে দেওয়া হচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বর '০৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে Present Status on Singur প্রকাশ করেছে, তাতেও সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি উল্লেখ করে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইনের ৪ নং ধারায় আপত্তি জানাবার যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তার প্রত্যুত্তরে APDR এর পক্ষ থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে শুনানির দাবি জানানো হয়েছিল।[২৬] সরকার তার জবাব দেয়নি—এ বিষয়ে এবং আরো কয়েকটি আইনগত প্রশ্নে APDR-এর মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। এই আইনে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সুপ্রীমকোর্ট সহ বিভিন্ন হাইকোর্টে যে সব মামলা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে আদালত সে সব ক্ষেত্রেই আইন লঙ্ঘনের মাত্রা ও গুরুত্ব যা-ই হোক না কেন, কেবলমাত্র অভিযোগকারীর এক্তিয়ার *(locus standi)* ও আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার (maintainability) প্রশ্ন তুলে, অভিযোগের বিষয়বস্তু বিবেচনা না করেই মামলা খারিজ করে দিচ্ছে। মনে হয়, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াতে কোনো হস্তক্ষেপ না করার দৃষ্টিভঙ্গী আদালত নিয়েছে। হেফাজতে হত্যা, ভূয়া সংঘর্ষে হত্যা সহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু বিষয়েই আদালতগুলি এবং সরকারী কমিশনগুলি সম্পূর্ণ আইন-বহির্ভূত ভাবে সরকারের

---

২৬. APDR No.156/2006 17.8.2006 to Land Acquisition Officer/Authority, Hooghly, with Ref. to Acquisition Notice no. 280-LA/IV-15/2006-07 dated 24.07.2006

বেআইনী কাজগুলিকে সুরক্ষা দেবার জন্য আইনী-প্রক্রিয়াকেও অকার্যকর করার কাজ করে আসছে—এ ক্ষেত্রেও সে রকম ঘটছে বলে ধরেই নেওয়া যায়।

ভারতে তুলনা নেই এমন ক্ষতিপূরণ?—কোনো ক্ষতিপূরণই নয় ঃ

জমি অধিগ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৮৯৪ সালের 'জমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪' টি প্রয়োগ করাই পছন্দ করছে, তার আরেকটা কারণ, এতে জমির দাম বাবদ বাজার দরে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়া আর কিছুই দিতে হবেনা সরকারকে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০০১ সালে একটি পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করলেও এবং গত বছর অক্টোবরে একটি সংশোধিত পুনর্বাসন নীতির খসড়া প্রকাশ করলেও সে নীতি মেনে পুনর্বাসন দেওয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা কেন্দ্রীয় সরকারেরও নেই রাজ্য সরকারগুলিরও নেই। যে কোনো কারণে কাউকে নিজের জীবিকা বা বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হতে হলে তাঁর সুষ্ঠু পুনর্বাসন পাবার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। সব বিশেষজ্ঞই প্রায় এ ব্যাপারে একমত যে জীবিকা বা বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ কার্যত কোনো ক্ষতিপূরণই নয়। সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার যে প্রায় ১৫০০০ মানুষকে জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করছেন তাদের মধ্যে একটা অংশকে কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজের দায় মেটাতে চাইছে। তারা আবার এটাকে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতে দেওয়া 'শ্রেষ্ঠ ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ' বলেও জাহির করছে। আর্থিক ক্ষতিপূরণ উচ্ছেদ হওয়া মানুষকে বিকল্প ব্যসস্থান ও জীবিকা যে দিতে পারেনা, তা উচ্ছেদ বিষয়ে বহু গবেষণাতেই সপ্রমাণিত। দেখা যায় ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওয়া টাকার বেশীর ভাগটাই বিকল্প জীবিকা সন্ধান করতে পারার আগেই সংসার চালাতে, অসুখের চিকিৎসায় বা বিয়ে, বাড়ি সারানো এ সব কাজে খরচ হয়ে যায়। খড়্গপুরে টাটার পিগ আয়রণ প্রকল্পে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের ফলাফল নিয়ে একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষায় দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রাপকই সাংসারিক প্রয়োজনেই টাকাটা খরচ করে ফেলেছেন। কিছু জন অংশত ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন বা কৃষি উপকরণ, জমি কেনা এসবের জন্যও খরচ করেছেন।[২৭] আর নিরুপম সেন, বিনয় কোনার[২৮], বলাই সাঁবুইরা[২৯] ক্ষতিপূরণের টাকা ব্যাঙ্কে রেখে উচ্ছেদ হওয়া কৃষকরা কত সুখে থাকতে পারবেন তার হিসেব দিচ্ছেন, প্রকল্পের ধারে ঝুপড়িতে থেকে দারোয়ান বা গৃহস্থালী ঝি-এর কাজ করে উন্নত জীবনের সন্ধান পাবেন তার 'স্বপ্ন' দেখাচ্ছেন।

২৭. Table 3, EPW 16 Oct. '04 Land Acquisition in a WB Dist. by Abhijit Guha

২৮. জমি বেচে ব্যাঙ্কে টাকা রাখলেও তো লাভ—বিনয় কোনার, 'নব সাম্রাজ্যবাদ ও কৃষি-শিল্প বিতর্ক' সংকলনে সংকলিত পৃ. ৬৫

২৯. বলাই সাঁবুই—দয়াবতী রায় ও পার্থসারথি সেনগুপ্ত পরিচালিত 'আবাদভূমি' তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার।

একবার উচ্ছেদ করা হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে 'উন্নয়নে'র জন্য ৪৭ লক্ষ একর জমি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ৩৬ লক্ষ জন বাসস্থান থেকে ও ৩৪ লক্ষ জন জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন—এই উচ্ছেদ মূলতঃ হয়েছে কংগ্রেস আমলের ডিভিসি প্রকল্পে এবং বামফ্রন্ট আমলের বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্পগুলিতে। তাঁদের মাত্র ৯ শতাংশ পুনর্বাসন পেয়েছেন, যদিও অন্ধ্রে ৩৩ শতাংশ, গোয়ায় ৩৪ শতাংশ, এমন কি উড়িষ্যাতেও ৩৩ শতাংশ পুনর্বাসন পেয়েছেন, আর এক বামশাসিত কেরালায় এটা আবার ১৩ শতাংশ[৩০] আবার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২০ শতাংশ উপজাতীয়, যদিও রাজ্যে উপজাতি রয়েছেন ৬ শতাংশ। এমন কি আর্থিক ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম। মেদিনীপুরে বিড়লাদের পিগ আয়রণের জন্য নেওয়া জমির অনেকেই এখনো জমির দাম বাবদ সামান্য টাকা টুকুও পাননি। কলকাতার বেলেঘাটা খালপাড়ের বস্তীবাসীদের উচ্ছেদে সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতিও রাখা হয়নি।

মানুষের আবাদভূমি তথা আবাসভূমি অধিগ্রহণের ফলে পরিবেশ, জীববৈচিত্র, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন—এ সবের যে ক্ষতি হয়, কোনো অর্থেই তার কোনো 'পূরণ' হয়না। নন্দীগ্রামে ভাষণ দিতে গিয়ে সেখানকার মানুষের দাবির প্রতিধ্বনি করে ১২ জানুয়ারী মেধা প্রশ্ন রেখেছেন— মাতঙ্গিনীর দেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতির কি ক্ষতিপূরণ হবে। আর '৯৫-তেই তো এ রাজ্যের সরকার ঘোষণা করেছিল, 'ক্রয়ক্ষমতা থেকে ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষের কাছে খোলাবাজারের কচকচানি মূল্যহীন। তা ছাড়া দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং এই দুনিয়ার সমস্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ইত্যাদি বিষয়গুলি এখনো খোলাবাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।''[৩১]

জীবিকা থেকে উচ্ছেদের কিছুটা মাত্র ক্ষতিপূরণ হতে পারে একমাত্র বিকল্প জীবিকার সংস্থান করে দিয়ে, বাসস্থান থেকে উচ্ছেদেরও কিছুটা মাত্র ক্ষতিপূরণ হতে পারে একমাত্র বিকল্প বাসস্থানের সংস্থান করে দিয়ে। সিঙ্গুর উচ্ছেদকাণ্ডে সরকারের এ সব ভাবনাতেই নেই, তাই উচ্ছেদকারীরা ব্যাঙ্কের সুদ, দারোয়ান বা ঝি-গিরির 'ব্যবস্থা'র প্রতিশ্রুতি দেওয়াকেই 'শ্রেষ্ঠ ক্ষতিপূরণের' প্যাকেজ বলে প্রচার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন।

"Leftwing Capitalism– a Senile Disorder"?

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুযোগ পেলেই আইনের শাসনের কথা বলতে ছাড়েন না। কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, এবং 'লাঙলের ফলায় কোর্টের আদেশ ছিন্নভিন্ন

৩০. TOI Editorial Article 13 Dec 2006 NOT A PEOPLE'S STATE West Bengal's poor rehabilitation record by Walter Fernands

৩১. গ্রাম উন্নয়নের সতের বছর—তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৫

করার' হুমকি দিয়ে সিঙ্গুরের মত বহু-আলোচিত জমি অধিগ্রহণের বিষয়েও সরকার কত অবলীলায় একের পর এক বে-আইনী কাজ করে গেছে তার একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। ১৯ জুলাই ২০০৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর একটি নোটিশ জারি করে সিঙ্গুরের গোপাল নগর, খাসের ভেড়ি, বাজেমেলিয়া, সিংয়ের ভেড়ি ও বেড়াবেড়ি মৌজায় জমি/সম্পত্তি কেনা-বেচা, ভাড়া বা বন্ধক দেওয়া সহ যে রকম হস্তান্তর রাজ্য সরকার ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে করা নিষিদ্ধ করে।[৩২] অথচ এই নোটিশ প্রত্যাহার না করেই রাজ্য সরকার নিজেই পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমকে ১লা ডিসেম্বরের আগেই জমি হস্তান্তর করে—তারা বিপুল পুলিশবাহিনী/ক্যাডারবাহিনীর সন্ত্রাসের সাহায্যে সে জমিতে ২রা ডিসেম্বরের আগে বেড়াও দিয়ে দেয়। ৪ঠা ডিসেম্বর কোনো আমলার বিষয়টি নজরে আসায় তড়িঘড়ি ফ্যাক্স মারফত আগের আদেশ সংশোধন করে শিল্পোন্নয়ন নিগমকে ঐ জমি কেনার অনুমতি দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর তাদের ৩৮১ নং মেমোতে।[৩৩] এর অর্থই দাঁড়াচ্ছে ১ ও ২ ডিসেম্বর সিঙ্গুরের ঐ জমি শিল্পোন্নয়ন নিগমকে হস্তান্তর করা বে-আইনী ছিল এবং নিগম ঐ জমিতে যে বেড়া দিয়েছে তা-ও বে-আইনী। কারখানা করতে হলে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক এবং তার জন্য Environment Impact Assessment Audit করাতে হয়। জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন) ১৯৭৪ এর ২৫ নং ধারা অনুসারে এ রকম কারখানা স্থাপনের জন্য কোনো রকম পদক্ষেপ নেবার আগেই রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর কাছ থেকে কারখানা স্থাপনের জন্য সম্মতি নিতে হবে।[৩৪] টাটার কারখানার জন্য সিঙ্গুরের কৃষিজমির চরিত্র পরিবর্তন (Conversion) করা দরকার। রাজ্য ভূমি

৩২. Govt. of WB., Finance Deptt. Revenue Branch Notification No.1214-F.T dated 19 July, 2006 published in The Calcutta Gazette Extraordinary dated 19 July, 2006

৩৩. Govt. of WB., Commerce and Industres Deptt. Memo No.381 dated 4 December, 2006

৩৪. Sec. 25 (1) of Water (Preventon & Control of Pollution) reads :

"(1) Subject to the provisions of this section no person shall without the previous consent of the State Board,

(a) establish or take any steps to establish any industry, operation or process, or any treatment and disposal system or an extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land (such discharge being hereafter in this section referred to as discharge of sewage); or

(b) bring into use any new or altered outlets for discharge of sewage; or

(c) begin to make any discharge of sewage;"

ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী তার জন্য Detailed Project Report এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর No Objection Certificate বাধ্যতামূলক।[৩৫] টাটার কারখানার জন্য এ সব আইনী বিধানের কোনোটিই মানা হয়নি। আইনসম্মতভাবে হবার আগেই জোর করে জমি দখল করে বেড়া দিয়ে কার্যত জমির চরিত্র পরিবর্তন (Conversion) করা হয়েছে।

বিশ্বায়ন-উদারীকরণের খোলা হাওয়ায় জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়ে পুঁজির স্বার্থরক্ষা ঃ

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের প্রবক্তারা ন'য়ের দশক থেকেই বলার চেষ্টা করছে সরকার ও রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা (Governance) সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আর সব বিষয় থেকে যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নাগরিক পরিষেবা, পরিকল্পিত শিল্পায়ন এসব থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে। সব বিষয়ই 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' নীতির, বাজারের নিয়মের অধীনে চলবে। অনেকে এটাকে রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের সূচনা (Erosion of the state) বলেও দেখানোর চেষ্টা করছিলেন।

বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের নীতি প্রয়োগ শুরুর দেড় দশক অতিক্রান্ত হবার পর আজ দেখা যাচ্ছে, একদিকে রাষ্ট্র তার যাবতীয় জনকল্যাণ মূলক দায়দায়িত্ব এবং সামাজিক উত্তরণের ভূমিকা কার্যকর ভাবে ঝেড়ে ফেলেছে—খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয় এসব ক্ষেত্রে সমাজের সবথেকে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ সরকারী ব্যবস্থার কাছ থেকে যেটুকু সহায়তা পেতো (অন্ততঃ সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেতো) তার দায়-দায়িত্ব সরকার নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক, চিরাচরিত পুঁজিবাদী বা 'বুর্জোয়া-সামন্ত' রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় 'মরূদ্যান'রূপে বিরাজমান পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার—সবার ক্ষেত্রেই এটা সমানভাবে সত্য। এরই সঙ্গে 'শিল্পায়ন', 'উন্নয়ন' এসব শব্দমালার আড়ালে পুঁজির স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র অতিতৎপর হয়েছে।

পুঁজির স্বার্থরক্ষার জন্য 'উদারীকরণে'র যে ধারাবাহিক কার্যক্রম গত ২৫ বছর সময়কালে রাষ্ট্রগুলি নিয়েছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য ঃ (১) শ্রমশক্তির অবমূল্যায়ন ঘটানো—শ্রম, মজুরী ও শ্রমিকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেটুকু অধিকার গত দু'শো বছরের শ্রমিক আন্দোলনে অর্জিত হয়েছিল, সেগুলো কেড়ে নেওয়া—কাজের সময়, ন্যূনতম মজুরী, চাকুরীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনগুলো বাতিল বা নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ভয়/লোভ দেখিয়ে কব্জা করার মাধ্যমে শ্রমিক-বিক্ষোভ দমন করে সবরকম নির্যাতন মেনে নিতে বাধ্য করা। (২) সরকারী আয় তথা ক্ষমতাকে পুঁজি

৩৫. Govt. of WB., Land and Land Reforms Deptt. Memo No.5024-GE/345/96 dated 28.7.1999 para 10

তথা পুঁজিপতিদের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরীতে ব্যবহার করা। সাধারণ মানুষের ট্যাক্সে রাস্তাঘাট তৈরী হবে মানুষের তথা সামাজিক প্রয়োজনে নয়, শিল্পপতিদের মুনাফা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে। বিদ্যুত-জ্বালানী-প্রাকৃতিক সম্পদের আহরন এ সবেরও লক্ষ্য একটাই, এবং তাতে মানুষের, সংখ্যাধিক মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণের বিষয় অনুপস্থিত থাকবে। (৩) গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যও একটাই—তা হল সর্বাধিক মুনাফা এবং শ্রমশক্তির সর্বাধিক শোষণ। (৪) পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার বিষয় ও এ সম্পর্কিত আইনগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা।

উদারীকরণের কর্মসূচীর সঙ্গে প্রায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে রাজনৈতিক বিরোধী ও বিক্ষুব্ধ মানুষদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও রাষ্ট্রের মদতে তৈরী নানান ধরনের প্রাইভেট আর্মিও এই সন্ত্রাসে অংশ নেয়। সিঙ্গুরে তা-ই ঘটেছে—নন্দীগ্রামে তা আরো খোলাখুলিই হয়েছে। এরই সঙ্গে থাকে অধিকার, বিশেষত নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য আইন করে বা আইনবহির্ভূতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করা। সিঙ্গুর থানা এলাকায় ৩০ নভেম্বর চন্দননগর মহকুমা শাসক ১৪৪ ধারা বলবত করে এক আদেশ দেন। তাতে এই রকমই আইনবহির্ভূতভাবে সিঙ্গুর থানা এলাকায় যাঁরা যা হোক কোনো অসদুদ্দেশ্য নিয়ে আসছেন বা আসার চেষ্টা করছেন তাদের প্রতি ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[৩৬] এই আইনবহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করেই মেধা পাটকর, মমতা ব্যানার্জী সহ অন্যান্যদের উপর বলপ্রয়োগ করে সিঙ্গুরে আসতে দেওয়া হয়না।

প্রযুক্তির অপপ্রয়োগে শ্রমশক্তির শোষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের লুন্ঠন ঃ

পশ্চিমবঙ্গে টাটার মটরগাড়ি কারখানার প্রকল্প অন্ততঃ এ রাজ্যে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের কাছে চ্যালেঞ্জ—কারণ সরকার পরিচালনা থেকে শুরু করে উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শ্রমশক্তিকে সর্বাধিক শোষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের লুন্ঠনের অনেকগুলি বিষয় এখানে প্রযুক্ত ও পরীক্ষিত হবে। দেশকে লগ্নীপুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করার জন্যই এটা প্রয়োজন।

হয়তো অনেকেরই জানা নেই, টাটার প্রস্তাবিত কারখানায় শিল্প প্রযুক্তির যে বিশেষ ধরনটি প্রযুক্ত হবে তার উদ্ভাবন করেছিল আমেরিকার সামরিক সংগঠন 'পেন্টাগন'। ১৯৭৮ সালে 'ম্যানটেক' (Manufacturing Technology-MANTECH) নামক প্রকল্পে কয়েক বছর ধরে মার্কিন জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় গবেষণা চালানোর ফলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি '৮০ সাল নাগাদ হস্তান্তরিত করা হয় শিল্পপতিদের কাছে।[৩৭] 'সরকার পরিচালনা' ছাড়া অন্য সব বিষয় থেকে রাষ্ট্রকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে এই দাবির

৩৬. SDO, Chandernagore order No. 345/1(7)/C/Cgr dated 30.11.2006.
৩৭. Propaganda and Public Mind–Noam Chomsky, 2001, page 17.

আড়ালেই সরকার সরকারী গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি জনকল্যাণে ব্যবহারের পরিবর্তে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিয়েছে আরো মুনাফার জন্যে। শিল্পজগতকে রাষ্ট্রের যুক্তিসঙ্গত সুরক্ষা দেবার বিষয়টিকে অতিক্রম করে তাদের সাহায্য করার জন্যে সরকারী সম্পদ ও অর্থভাণ্ডারকে পুরোপুরি খুলে দেওয়ার যে কাজটি এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার করছে, বাস্তবিকপক্ষে রেগান প্রশাসন '৮০-র দশকে আমেরিকায় সে কাজটি শুরু করেছিল। সে সময় শুধু আমেরিকা নয়, গোটা ইউরোপই শিল্পক্ষেত্রে মূলতঃ জাপানের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছিল। ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার এবং তাদের 'হারিয়ে দিয়ে' এ রাজ্যে পুঁজি আকর্ষণ করে 'শিল্পোন্নতি'র জন্য সরকারের মরিয়া চেষ্টার একটা সাদৃশ্য এখানে স্পষ্টতঃই রয়েছে। ম্যানটেক প্রযুক্তি পরবর্তী কালে ভোগ্য পণ্য (Consumer goods) উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকেও অনুন্নত ও উন্নতিশীল তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোকে পুরোপুরি হটিয়ে সেখানে সাম্রাজ্যবাদী শিল্পগোষ্ঠীকে বাজার করে দেবার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

MANTECH প্রযুক্তিতে বাড়তি মুনাফার উৎস কি, তা টাটাদের সিঙ্গুর মোটরগাড়ি প্রকল্পের পটভূমিতে একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সিঙ্গুরে টাটার মোটরগাড়ির মূল কারখানা বাস্তবিকপক্ষে একটা যন্ত্রাংশ জোড়া দেবার কারখানা হবে। কোনো যন্ত্রাংশই টাটা কর্তৃপক্ষ উৎপাদন করবে না। যে সব ছোট উৎপাদক (ওদের ভাষায় ভেণ্ডার - Vendor) এগুলো তৈরী করবে, টাটা তাদের সরকারের কাছে বিনি পয়সায় পাওয়া জমিতে জায়গা দেবে। এই ব্যবস্থায় টাটা কর্তৃপক্ষের লাভ তিনগুণ-চর্তুগুণ হবে।

প্রথমতঃ প্রচলিত শিল্প-শ্রমিক বিধি অনুযায়ী সব যন্ত্রাংশ যদি টাটার কারখানায় তৈরী হত, তবে এর সঙ্গে যুক্ত সব শ্রমিককেই (সরকারী হিসেব সত্যি হলে ancillary industry-র প্রায় দশ হাজার শ্রমিক সহ প্রায় এগারো হাজার জনকে) মোটরগাড়ি শিল্পের প্রচলিত মজুরী দিতে হত এবং অন্য সংগঠিত ক্ষেত্রের মত তাদের কিছু কিছু অধিকারও সুরক্ষিত থাকতো। Mantech ব্যবস্থায়, সরকারের বক্তব্য ঠিক হলে ৮০০ জন হবেন মটরগাড়ি শিল্পের কর্মী, বাকি (প্রায় ১০০০০ জন) কার্যতঃ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্প শ্রমিক হবেন। এঁদের মজুরী, কাজের সময়, চাকুরীর নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকবে না। লেদ মেসিনে যে শ্রমিক কাজ করবেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী তাঁর দৈনিক মজুরী হবে ৮০ থেকে ১০০ টাকা। সে ক্ষেত্রে মটরগাড়ি শিল্পের মজুরীব্যবস্থা অনুযায়ী দু থেকে আড়াই গুণ পাবার কথা তাঁর। এভাবে দেখা যাবে কম দামের গাড়ির দাম যেটুকু কম হল তার পঞ্চাশ শতাংশ আসবে শ্রমিককে কম মজুরী দিয়ে। এই নতুন উৎপাদন কৌশলে ভারতের মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পে ২০০৫-০৬ এ বিক্রি ২৭.৩ শতাংশ

বাড়লেও লাভ বেড়েছে ২০.৫ শতাংশ—অর্থাৎ বিক্রিবৃদ্ধির ৭৬ শতাংশই জমা হয়েছে লাভের খাতায়।

দ্বিতীয়তঃ ভেণ্ডার পার্কের জন্য যে জমি (সরকারী হিসেবে ৩০০ একর) টাটারা সরকারের কাছ থেকে পাবে, সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী সেখানে টাটার যন্ত্রাংশ উৎপাদকরা তিনটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের (first tier vendors) উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করবে। এই সব উৎপাদন কেন্দ্রের জমির মালিকানা টাটাদের হাতেই থাকবে—যারা সেখানে উৎপাদন কেন্দ্র করবে তাদের টাটাদের কাছ থেকেই জমি লিজ নিতে হবে—টাটাদের শর্তে। তাই প্রাথমিকভাবেই টাটারা ৩০০ একর জমিতে প্রোমোটারি করবে, এটা সরকার মেনেই নিয়েছে। রাজারহাটের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রতি কাঠা জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ১৩৬৫০ টাকা, সরকারী হিসেবেই ঐ জমি বিক্রী করা হয়েছে প্রতি কাঠা ১,৬০,০০০ টাকা দরে। বর্ধমানের নবহাটে বাস টার্মিনাস প্রকল্পে ১০ টাকা বর্গফুট দরে জমি 'অধিগ্রহণ' করে তা 'উন্নয়ন ও নির্মাণে' প্রায় ৬০০ টাকা প্রতি বর্গফুটে খরচ দেখানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিক্রী হয়েছে ৩০০০ টাকা প্রতি বর্গফুট। ১০ টাকা মূলধনে লাভ প্রায় ২৪০০ টাকা। শুধু এই ৩০০ একর জমি থেকেই প্রোমোটারি করে (লাইসেন্স ফি, লিজ ফি ইত্যাদি বাবদ) টাটারা প্রথম বছরেই ১০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিংহভাগই পুষিয়ে নেবে। সুতরাং বিনি পয়সায় টাটাকে জমি ও অন্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে 'বিনিয়োগ' এর ধূয়া তুলছে তার পুরোটাই মিথ্যে হবে।টাটারা যে এটা করবে তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। কয়েক বছর আগে টাটারা সরকারী টেলিফোন সংস্থা বি এস এন এল-এর একাংশ কিনে নেয় ২৭০০ কোটি টাকায়—সি পি আই (এম) সমেত বিরোধীদের অভিযোগ ছিল টাটাদের ঐ কোম্পানীর যা দাম হওয়া উচিত তার এক-তৃতীয়াংশ দামে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-নেতা এতে প্রচুর 'কাট মানি' পেয়েছে। বছর খানেকের মধ্যেই ঐ কোম্পানীর সংরক্ষিত তহবিল থেকে ২৭০০ কোটি টাকা টাটারা নিজেদের মূল কোম্পানীর তহবিলে স্থানান্তরিত করে নেয়। এইভাবে ভারতের মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় তৈরী ভারতের ছোট-বড় শহর- গ্রামে বিস্তৃত বিপুল সম্পদ ও পরিকাঠামো টাটারা বিনা পয়সায় হাতিয়ে নিয়েছিল কিছু মন্ত্রী-নেতার সহায়তায়। সি পি আই (এম) সমেত বিরোধীরা এ নিয়েও যথেষ্ট হৈ চৈ করেছিল। ঐ পর্যন্তই।

তৃতীয়তঃ টাটার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা বছরে এক লক্ষ গাড়ি তৈরী। গুরগাঁও এর মারুতি (সাড়ে তিন লাখ গাড়ি তৈরীর জন্য ৬৫০ একর), চেন্নাই এর হুণ্ডাই (আড়াই লাখ গাড়ি তৈরীর জন্য ৫০০ একর), পুনার টাটা মোটরস (৪.২ লাখ গাড়ি তৈরীর জন্য ৭০০ একর) এর মূল কারখানার জমির যে 'গোপন' হিসেব পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিতরণ করেছে, তা সত্যি হলেও টাটার মূল কারখানার জন্যে ২০০ একরের

বেশী জমি লাগবেনা। কোনো সময় বছরে ৫ লাখ গাড়ি তৈরী হবে এই অনুমানে টাটার মূল কারখানার জন্যে ৭০০ একর জমি রাখা হচ্ছে।[৩৮] এই ৭০০ একরের ৭০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৫০০ একর নাকি খোলা জায়গা ও রাস্তাঘাটের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। গাড়ি বাজার না পেলে ২-৩ বছরের মধ্যেই এই জমিটা তারা প্রোমোটারি করে বিনিয়োগের কয়েকগুণ উশুল করে নেবে। বাজার পেলেও কারখানার আয়ু (এখনকার হিসেবে ২০-২৫ বছর) শেষে স্বচ্ছন্দে এটা করতে পারবে।

একদিকে রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর ভূমিকা থেকে রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনা, অপরদিকে সরকারের যাবতীয় সঙ্গতি ও ক্ষমতা (Resource and Capabilities) কে শিল্পপতিদের প্রয়োজনে সমর্পণ করার সঙ্গে রাষ্ট্র ও সরকারী পরিচালন ব্যবস্থায় শিল্পপতি বা তাদের গোষ্ঠীগুলিই নির্দ্ধারক ভূমিকা পালন করছে। সিঙ্গুর প্রসঙ্গে দেখা যাবে কি শিল্প হবে নির্দ্ধারণ করেছে শিল্পপতি গোষ্ঠী, কোথায় হবে ঠিক করেছে তারাই। মুখ্যমন্ত্রীর দল এবং বামফ্রন্ট বা সরকার তাদের কোনো কর্মসূচীতেই কম দামের মোটরগাড়ি তৈরীর কারখানা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে কোনো সময়েই সিদ্ধান্ত করেনি। এখন তারা চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে সরাসরিই বলছে টাটারা চেয়েছে, অতএব করতে হবে, টাটারা ঐ জমি চেয়েছে অতএব ঐ জমিই দিতে হবে। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠেছে সরকার চালাচ্ছে কে—রাজনৈতিক দলগুলো না তাদের বকলমে শিল্পপতিরা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে আমেরিকাতেও এ ব্যাপারটিই ঘটেছে। আমেরিকান সরকারের উপর শিল্পপতি গোষ্ঠীর, বিশেষ করে তেল শিল্পপতিদের আধিপত্য, শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধি বুশের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়া এবং সামরিক লবি-শিল্পপতি গোষ্ঠীর মেল বন্ধন এবং আমেরিকার আফগানিস্তান-ইরাক আক্রমণ ও দখল পরস্পর সংযুক্ত ঘটনাবলী।

কংগ্রেস, বি জে পি পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে, অথচ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সরকারগুলি একই কায়দায় হাজার হাজার একর কৃষিজমি শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এ ক্ষেত্রেও দ্বিচারিতা স্পষ্টই।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বা বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি সহ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যে এখন সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর শিল্পপতিদের অনুমোদন ও নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুই করতে পারে না, সিঙ্গুরের ঘটনা অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এ ব্যাপারটাকেও স্পষ্ট করে দিয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারী, প্রত্যক্ষভাবে জমি যাচ্ছেনা এমন মানুষজন এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও স্বাধীনতার মর্যাদায় বিশ্বাসী সমস্ত মানুষকে, দল-মতের বেড়া ভেঙে দিয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এই বিপদ উপলব্ধি করতে হবে।

৩৮. Passenger Car Manufacturing : Global Trends–NATRIP Confidential

ঐতিহাসিক কৃষি-শিল্প বিতর্ক ?

তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ সিঙ্গুরের গণআন্দোলনকে ইতিহাসগতভাবে চলে আসা 'কৃষি-শিল্প বিতর্ক', ইতিহাসগতভাবে এই দ্বন্দ্বে শিল্পই জিতবে—এ সব কথা বলে আসছেন এবং এ সবের সমর্থনে মার্কস সহ রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের কথা উদ্ধৃত করে আসছেন। এ সম্পর্কে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যথেষ্ট হবে।

প্রথমত সিঙ্গুর আন্দোলনের মূল বিষয় হল উন্নয়নের 'মডেল' এবং প্রস্তাবিত 'উন্নয়নে'র সুফলগুলিতে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অংশভাগের অধিকারের প্রশ্ন।—এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, স্বনির্ভরতার অনেকগুলি প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক উৎপাদনের ভূমিকার বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে। ঠিক সেই কারণেই সিঙ্গুরের আন্দোলনে সেখানকার কৃষিজীবী জনগণই মূল শক্তি হলেও আশপাশের কারখানায় কর্মরত স্থানীয় শ্রমিক ও গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশও এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই আন্দোলনের জন্য 'সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি' নামে যে সংগঠন তাঁরা গড়েছেন, তার যুগ্ম আহ্বায়কদের একজন—বেচারাম মান্না ধুঁকতে থাকা এক চটকলের শ্রমিক, আরেকজন শঙ্কর জানা পেশায় মৃৎশিল্পী । সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্থানীয় বিধায়ক—কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ততটা নয়, একজন উদারহৃদয় দরদী শিক্ষক হিসেবেই স্থানীয় এলাকায় তাঁর পরিচিতি। এবং এঁরা সকলেই কোনো না কোনো সময় বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তও ছিলেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের সমর্থনে যেসব সামাজিক ও অধিকার আন্দোলনের মানুষ ও সংগঠন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠন, লিটল ম্যাগাজিন ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী জড়ো হয়েছেন, সংগঠিত হয়েছেন, সংহতিমূলক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তাঁরা কেউ-ই সামন্ত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পক্ষে বা উন্নয়নের যথাযথ প্রয়োজন যাচাই করে সেই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্প-স্থাপনের বিরোধী—এ কথা কোনো নিন্দুকও বলবে না। দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসকে তো আবার 'বিশ্বায়ন-উদারীকরণ' কর্মসূচীর রাজনৈতিক বিরোধী এ কথা বলা যাবেনা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল—২০০৬-এর পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুরের কৃষক মার্কস বর্ণিত সময়ের 'নির্বোধ কৃষকে'র সমগোত্র কিছুতেই নন। ভুললে চলবেনা, এঁরা জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তা বাদে নিজেদের কৃষি আয়ের উদ্বৃত্ত অংশকে কৃষিতেই 'বিনিয়োগ' করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন—সিঙ্গুরের টাটার কারখানার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট জমিটিতেই যে গভীর ও অগভীর নলকূপগুলো রয়েছে, সেগুলির বেশীর ভাগ তাঁদের ব্যক্তিগত ও যৌথ আর্থিক দায়ভারে তৈরী। মিনি ট্রাক্টর কেনা, বিপুল পরিমাণে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, পরিবারের শিক্ষিত মানুষ এবং মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কৃষিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ঘটনাও এদিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয় ঃ

সিঙ্গুরের মানুষের, সিঙ্গুর প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবী-বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের তথ্যনির্ভর সত্য ও যুক্তির সামনে সরকারের আশ্রয় মিথ্যা এবং অপপ্রচার। শক্তিশালী মিডিয়ার একটা বড় অংশ এই অপপ্রচারে সরকারের মুখ ছিল ঠিকই, সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও কিন্তু তথ্য ও সত্য হাজির করতে সচেষ্ট ছিলেন সমানেই। প্ররোচনা-সন্ত্রাস-হত্যা-ধর্ষণের মুখেও সিঙ্গুর আন্দোলন যখন গণতান্ত্রিক বোধ-বুদ্ধি-সীমারেখার লক্ষ্মণরেখার মধ্যে থাকবার চেষ্টা করছেন, সরকার ও সরকারী দলের সর্বোচ্চ আসনে আসীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতির আগে দেখা যায়নি এমন এক নিম্নতার নজির গড়েছেন। স্পেনের ফ্যাসিবিরোধী লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেনাদের কথা, কিউবার বিপ্লবে চে গুয়েভারার কথা কিম্বা চীনে নর্মান বেথুন বা কোটনিসকে ভুলে গিয়ে,মার্কসীয় দর্শনকে বিদেশীদের মতবাদ বলে জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণও ভুলে গিয়ে সিঙ্গুরের পাশে দাঁড়ানো মানুষদের, মেধা-মহাশ্বেতাদের 'বহিরাগত', 'ওরা কারা' বলে আক্রমণ করা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না—রাজনীতি, চিন্তা ও সংস্কৃতির দৈন্য এ পর্যায়ে পৌঁছেছে এটা ভাবতে কষ্টই হয়। মেধা কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে বলেছেন, 'বামপন্থীয়োঁ বামপন্থা মত ছোড়ো', বলেছেন, 'বামপন্থীয়োঁ হোঁশমে আও'—সভায় জমায়েত মানুষ, পথচলতি মানুষ তার প্রতিধ্বনি করেছেন। তখনকার 'বহিরাগত', এখন ক্ষমতার আসনে আসীন কারো কারো রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি '৪৬-এ সিঙ্গুরের তেভাগার লড়াইয়ের মাঠেই যে হয়েছিল এটাও ভাবতে কষ্টই হয়।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৈন্যের আরো প্রকট প্রকাশ ঘটেছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথাবার্তা ও আচরণে। স্বৈরাচারী শাসকদের মতই ভঙ্গীতেই তিনি বলেছেন, 'আমরা ২৩৫, আর ওরা শুধু ৩৫।' তিনি ভুলে গেছেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দাবি করে বিরোধী সংখ্যালঘু মতামতকেও মর্যাদা দেওয়া—বিরোধী মতামতকে, সংখ্যালঘু মতামতকে যিনি যে পরিমাণে মর্যাদা দেন, গণতান্ত্রিকতায়, বহুস্বরত্বে তিনি সেই পরিমাণেই আস্থাশীল। তিনি আরো ভুলে গেছেন, সত্য অনেক সময়েই সংখ্যালঘুদের কাছেই থাকে—এক সময় লেনিন বা মাও সে-তুঙও ছিলেন সংখ্যালঘু—কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যকে ধারণ করছিলেন তাঁরাই। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় কমিউনিস্টরা বা বামপন্থীরা যখন এরকমই সংখ্যালঘু ছিলেন, তখনও'প্রতিক্রিয়াশীল' মুখ্যমন্ত্রীরা—বিধান রায়-প্রফুল্ল সেন-সিদ্ধার্থ রায়েরা এরকম স্বৈরাচারী মন্তব্য করেছেন বলে জানা নেই। জানা নেই গুজরাতের নরেন্দ্র মোদী বা ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁদের রাজ্যে এক আঙুলে গোনা যায়, এমন সি পি আই (এম) বিধায়কদের উদ্দেশ্যে এমন ধরনের কথা বলেছেন বলে। একদিকে

টাটা-সালেমদের তোষণের সময় টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর এক বিগলিত গদগদ ভাব দেখা যায়। আরেক দিকে বিরোধীদের প্রতি, এমনকি বামফ্রন্টের অন্য শরিকদলগুলির প্রবীণ নেতাদের প্রতিও অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য এবং চরম অবমাননাকর আচরণ ও মন্তব্যগুলি আমাদের সেই ‘কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে..’ ইত্যাদির কথা মনে না করিয়ে দিয়ে পারে না। বিরুদ্ধ মতকে যুক্তি-তথ্য দিয়ে খণ্ডনের চেষ্টা না করে ক্ষমতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার বর্বরতা দিয়ে দমন করার চেষ্টা স্বৈরাচারীরাই করে এবং ইতিহাস তার জন্যে তাদের সমুচিত শিক্ষাও দেয়।

১৪৪ ধারা জারি করে বেআইনীভাবে কৃষদের জমি বেড়া দিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে মমতা ব্যানার্জী সহ সিঙ্গুর ও অন্যত্র বিক্ষুব্ধ মানুষেরা অনশন শুরু করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান যে ভাষায় ও যে ভঙ্গিতে ‘না খেলে শরীর খারাপ হওয়ার’ কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন—একবার নয়, বহুবার, তাতে তাঁর রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মর্যাদা পাবার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মানসিক সুস্থতা আছে কিনা সন্দেহ জাগে। আর মানসিক সুস্থ কোনো নেতার এ রকম আচরণের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে তাঁর নিজের ও যে দল তাঁদের মত নেতার নেতৃত্বে চলে, তার সাংস্কৃতিক অবক্ষয় কোন তলানিতে ঠেকেছে তার উপলব্ধিতে।

শুধু তিনি একাই নন, বর্তমান ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ও প্রতিবাদী মানুষদের অনশন আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের দাবি রাজনৈতিকভাবে মুখোমুখি হবার পরিবর্তে, অনির্দিষ্টকালের অনশন ধর্মঘটের ফলে যে সঙ্কট তৈরী হয়েছে তাতে হস্তক্ষেপের দাবি যখন সমাজের সমস্ত অংশ থেকে উঠেছে, তখন তাঁরাও ‘দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হবে’, ‘শুধু শুধু অনশন করে মরে গিয়ে লাভ কি’—এ ধরণের রাজনীতি বিবর্জিত প্রলাপোক্তি করে দিশাহীনতার পরিচয় রেখেছেন।

সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম...হরিপুর—আন্দোলনের ভাষা ছাড়া সরকার কিছুই বোঝেনা ঃ

সিঙ্গুর আন্দোলনের মূল দাবি—কৃষিজমি ছাড়ার দাবি এখনো পূরণ না হলেও সরকারকে যথেষ্ট পর্যুদস্ত করে সিঙ্গুরের আন্দোলন ইতিমধ্যেই প্রাথমিক জয় অর্জন করেছে। সরকারকে অন্ততঃ তিনবার জমির ম্যাপ বদলাতে হয়েছে। টাটাদের হাতে জমি হস্তান্তরের তারিখ কৃষক আন্দোলনের চাপে অন্ততঃ সাত-সাত বার পেছোতে হয়েছে—সম্ভবত ২৮ ডিসেম্বর ’০৬ হস্তান্তরের চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সম্ভাব্য জনরোষের ভয়ে তা প্রকাশ করতে পারেনি সরকার। জমির দাম প্রাথমিক প্রস্তাব গড়ে ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লক্ষ টাকা প্রতি বিঘা করতে হয়েছে। দলের ফতোয়া, প্রশাসনিক চাপ, পুলিশি সন্ত্রাস, এলাকাকে কার্যতঃ মিলিটারী ব্যারাকে পরিণত করা, নানান প্রতিশ্রুতি আর প্রলোভনের টোপ এসব সত্বেও সিঙ্গুরের প্রতিজ্ঞা আজো অটল— ৪০% এরও

বেশী জমির মালিক আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন জমি তাঁরা দেননি, জমি তাঁরা দেবেন না। পুলিশ-ক্যাডার বাহিনীর সশস্ত্র সন্ত্রাসের মধ্যে মাঠভর্তি পাকাধানে কিম্বা অঙ্কুরিত আলুচারা সমেত পুরো এলাকা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ১৪৪ ধারা জারি করে ব্যাপক পুলিশ-ক্যাডার সন্ত্রাস নামিয়ে অনিচ্ছুক কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে ‘স্বেচ্ছায় জমি বিক্রী করার সম্মতিপত্র’ আদায়ের চেষ্টা হয়েছে।

২৫ সেপ্টেম্বর পুলিশি আক্রমণে আহত গোপালনগরের যুবক রাজকুমার ভুলের পরদিন মৃত্যু হয়েছে, সিঙ্গুরের আন্দোলন তাঁকে প্রথম শহীদের মর্যাদা দিয়েছে। তার হত্যার জন্য দায়ীদের বিচার ও শাস্তির সম্ভাবনা আজও সুদূরপরাহত।

মণিপুরের মনোরমা থাঙ্গিয়াম বা কাশ্মীরের কুনান পোশপোরার মহিলাদের ওপর—সর্বত্রই প্রতিবাদী মানুষদের উপর ধর্ষণ-হত্যা রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের অন্যতম পদ্ধতি। শাস্তির সম্ভাবনারহিত ভাবেই পুলিশ মিলিটারি এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকা ভাড়াটেরা এ কাজ করে যায়। এই পটভূমিতেই ১৮ ডিসেম্বর বাজেমেলিয়ার ১৮ বছরের কিশোরী তাপসী মালিকের কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে কয়েকশো পুলিশ ও পাহারাদারের ঘেরাটোপে খোলামাঠে ধর্ষিতা ও নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পনেরটির মত ফৌজদারি মামলায় প্রায় দু’শোর মত প্রতিবাদী নারী-পুরুষকে ভারতীয় দণ্ডবিধির মারাত্মক সব ধারায় অভিযুক্ত করে জেলে পোরা, আদালতে হয়রানি করা চলছে। শুধু ঝাঁটা হাতে মিছিল করা বা অবস্থান বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য বিস্ফোরক পদার্থ আইন, অস্ত্র আইন, হত্যার চেষ্টা এসব অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কৃষিজমি রক্ষা কমিটির শীর্ষনেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে।

সাংসদ এবং ভারতীয় আইনে জেড ক্যাটাগরীর নিরাপত্তার অধিকারী বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে চরম হেনস্থা করা হয়েছে। সামাজিক ও পরিবেশ বাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী মেধা পাটকরকে অন্ততঃ তিনবার বলপ্রয়োগ করে, বেআইনীভাবে আটকে রেখে সিঙ্গুরে যেতে দেওয়া হয়নি। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার করা অন্যান্যদের নিয়ে কি করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে প্রতিবারই দু-তিনঘন্টা ধরে গাড়ীতে করে ঘোরানো হয়েছে। দিশাহীন প্রশাসন গ্রেপ্তার হওয়া মেধাকে কোনো রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা বা পাঁচতারা হোটেলে রাখার প্রস্তাব দিলে প্রতিবারই তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন—শেষ পর্যন্ত সরকার আবিষ্কার করেছেন, তিনি বা তাঁর মত বহিরাগতরাই সিঙ্গুরের যত সমস্যার মূলে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান আবার এর মধ্যে টাটার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মদতও খুঁজে পেয়েছেন—পাড়ার ক্লাবের কর্মকর্তা নির্বাচনের প্রতিপক্ষের মত কোনো প্রমাণ ছাড়াই রতনলাল টাটা তার প্রতিধ্বনিও করেছেন!

সিঙ্গুর আন্দোলনের জয়—সিঙ্গুরের শিক্ষা ঃ

সিঙ্গুর আন্দোলনের সব থেকে বড় জয় হল এটা দলমত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে

একটি সামূহিক অধিকারের দাবির পিছনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে। সাতমাস ধরে প্রলোভন-সন্ত্রাস-হুমকি এবং প্ররোচনা সত্বেও আন্দোলন এখনো পর্যন্ত আইনী-গণতান্ত্রিক সীমারেখার চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ২৯ বছরের বামফ্রন্টের শাসনকালে সরকারের সামনে এটাই সবথেকে কঠোর চ্যালেঞ্জ। সিঙ্গুর প্রশ্নটি স্পষ্টতঃই সমগ্র জনমতকে দুটি সুস্পষ্ট শিবিরে মেরুকরণ করেছে। এক মেরুতে সি.পি.আই(এম)—ঠিকভাবে বলতে গেলে তাদের মন্ত্রী ও অনুগৃহীত আমলাদের একটি চক্র, তার সঙ্গে টাটা ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যমগুলো। এমনকি বামফ্রন্টের ছোট শরিকরাও সরকারের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপগুলির পক্ষে সেভাবে সক্রিয় হন নি, বরং তাঁদের বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতা ও গণসংঠনগুলি প্রকাশ্যেই সরকারী নীতির বিরোধিতা করছে। অপর দিকে সমগ্র অসরকারী শক্তি, কংগ্রেস ভাবধারার বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী, নক্সালপন্থীরা, অ-সিপিএম মার্কসবাদীরা, নাগরিক অধিকার ও সামাজিক আন্দোলনের মানুষ জন এক ব্যাপক মঞ্চের চারপাশে জড়ো হয়েছেন। ২রা ডিসেম্বরের পুলিশি সন্ত্রাস এবং অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলার পর মমতা ব্যানার্জী যে অনির্দিষ্ট কালের অনশন শুরু করেন—পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পেরিয়ে তার ঢেউ সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। সিঙ্গুরের কৃষিজমি ধ্বংসর বিষয়টি সারা দেশে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলেও প্রবল আলোড়ণ তোলে। রাজেন্দ্র সাচার, অরুন্ধতী রায়, অরুণা রায়েরা দিল্লীতে সিঙ্গুরের আন্দোলনের সমর্থনে প্রতিবাদে নামেন—সরকারকে বাধ্য হতে হয় অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিতে। সিঙ্গুরের আন্দোলনের সমর্থনে ও সরকারের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ঐতিহাসিক সুমিত সরকার, তিস্তা শীতলাবাদ, প্রশান্তভুষণ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং, সঞ্জীব পাণ্ডে, সাংবাদিক সুমিত চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। কোলকাতায় কবি শঙ্খ ঘোষ, নাট্য ব্যক্তিত্ব শাঁওলী মিত্র, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব অপর্ণা সেন, অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র কবি-গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়, কবির সুমন সহ অনেকেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন।

এই মুহূর্তে সিঙ্গুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সিঙ্গুর কি পারবে পশ্চিমবঙ্গ—সারা ভারতের মানুষের সামনে দৃঢ় সঙ্কল্প বিরোধিতার যে নজির তারা তুলে ধরেছে, তাকে বিজয়ী করতে? শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় সিঙ্গুর অর্জন করতে পারুক আর না পারুক — তার বার্তা সে পৌঁছে দিয়েছে—যারা ভেবেছিল, পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচরদের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র, তাদের পরের বার পা ফেলার আগে আর একবার ভাবতেই হবে।

সিঙ্গুরের অনুপ্রেরণায় ইতিমধ্যেই যেখানে যেখানে সরকার উন্নয়নের নামে কৃষিজমি কেড়ে নেবার, মানুষের জীবন ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে, সেখানেই উঠছে প্রতিবাদের ঝড়। সিঙ্গুর থেকে শিক্ষা নিয়ে নন্দীগ্রাম-হরিপুর-

বারুইপুর-কাটোয়া-বারাসত-ডানকুনি সর্বত্র মানুষের উপলব্ধি আন্দোলনের ভাষা ছাড়া সরকার কিছুই বোঝেনা। সিঙ্গুরের মানুষের এবং তাঁদের দাবির সমর্থনে জড়ো হওয়া মানুষের আবেদন-নিবেদন, ধরনা-অনশন-হরতালের ভাষা সরকার বুঝতে চায়নি। তাই সিঙ্গুরের অভিজ্ঞতা নন্দীগ্রামের মানুষকে প্রতিবাদের ভাষা বদলাতে বাধ্য করেছে।

মানুষ যাতে শেষ পন্থা হিসেবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হন, তার জন্যই মানুষের অধিকার সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। আইন এবং আইনী ব্যবস্থা মানুষের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ না হলে মানুষ বিদ্রোহ করেনা—মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধের সারকথা এটাই।

প্রতিবাদী মানুষদের যদি প্রতিরোধের পথ নিতে হয়, যদি তাঁদের বিদ্রোহী হয়ে উঠতে হয়, তার দায় সরকারেরই—সিঙ্গুর আর তার পরের নন্দীগ্রাম থেকে শাসকদের এ শিক্ষাটুকু নিতেই হবে।

এই প্রতিবেদন শেষ করার সময় পর্যন্ত তাঁদের সাধ্যমত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন সিঙ্গুরের মানুষ। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম-হরিপুর-বারুইপুর-কাটোয়া-বারাসত-ডানকুনির মানুষ লড়ছেন—তাঁরা লড়বেনই, লড়তে তাঁদের হবে—কারণ এটা তাঁদের জীবনের অধিকারের লড়াই। সরকার হয়তো একটু ধীরে চলতে বাধ্য হচ্ছে—নন্দীগ্রামের নোটিশ একটু পরে বের করা হবে, 'সেজ'-এর রথের চাকা একটু মন্থর হবে। খাঁড়াটা কিন্তু ঝুলেই আছে। প্রকৃত পরীক্ষা তাই আমাদের সামনে—আমরা যারা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, উন্নয়নের লড়াই-এর কথা বলি, ভাবি—আমরা কি পারবো ওঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের ইতিহাস নির্দিষ্ট ভূমিকাটি পালন করতে? ❒

এই নিবন্ধের **'কৃষি জমি ছাড়া কি শিল্পায়ন সম্ভব নয়?'** শীর্ষক অনুচ্ছেদের ২১-২২ পৃষ্ঠায় হিন্দমোটর কর্তৃপক্ষের ফেলে রাখা জমি ও সেই জমি প্রোমোটারির জন্য বিড়লাদের না দেওয়ার জন্য সিটু-র দাবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
গত ১৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের 2675-GE(M)/5M-03/06 নং মেমোতে এক নির্দেশ জারি করে বলা হয়েছে, হিন্দমোটর কর্তৃপক্ষের বিনা আপত্তিতে ঐ জমির মধ্যে ৩১৪ একরে সরকারের মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল (resumed by the State Government, unopposed by the HM in exercise of powers u/s 6(3) of WB Estate Acqusition Act, 1953) এবং তা ১০.৫০ কোটি টাকা মূল্যে আবার হিন্দমোটর কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করা হল (and the said resumed land stands resettled wth M/s Hindustan Motors Ltd., under the second proviso of sub-section [1] of secton 14Z of the WB Land Reforms Act, 1953 on realisation of a consideration money amounting to Rs. 10.50 Crores)। উল্লেখ্য ঐ জমির বর্তমান বাজারদর অন্ততঃ ৯৫০ কোটি টাকা হবে।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সিঙ্গুর বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভরত কৃষকদের উপর ২৬ সেপ্টেম্বরের পুলিশি সন্ত্রাস এবং তার ফলে রাজকুমার ভুলের মৃত্যুর অভিযোগ

—APDR-এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

২৬ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই সিঙ্গুর বি ডি ও অফিসে কয়েক হাজার কৃষক পরিবারের অবস্থান বিক্ষোভে ব্যাপক পুলিশি তাণ্ডবের খবর জানিয়ে APDR-এর কাছে উদ্বিগ্ন মানুষজন ফোন করতে থাকেন। পুলিশি লাঠিচার্জে আহত শ'খানেক মানুষকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা খোঁজ করার জন্য তাঁরা APDR-এর সাহায্য চান। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত সকাল ৭-১৫ নাগাদ জেলার এস পির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। ধৃত ব্যক্তিদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, ধৃত ব্যক্তিদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা তিনি জানেনও না। অবশ্য তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কোন রকম দুর্ব্যবহার করা হবে না, তাদের সমস্ত আইনী অধিকার দেওয়া হবে ও ঐ দিনই বেলা দশটার মধ্যে তাদের আদালতে হাজির করা হবে। কোন আদালতে তাদের হাজির করা হবে, তা বেলা দশটার মধ্যে APDR-কে জানানোর প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন। এ প্রতিশ্রুতি তিনি রাখেন নি এবং তার পর থেকে ঐ দিন তাঁকে আর ফোনেও পাওয়া যায়নি।

সকাল আটটা নাগাদ উদ্বিগ্ন আত্মীয়-স্বজন জানতে পারেন, ধৃত ও আহত মহিলাদের চন্দননগর থানায় রাখা হয়েছে। তাঁদের কাছে খবর পেয়ে APDR-এর একটি টিম সাড়ে আটটার মধ্যে সেখানে পৌঁছে যান। ইতিমধ্যে জানা যায় যে আটক পুরুষদের চুঁচুড়া থানায় রাখা হয়েছে। সকাল ন'টা নাগাদ APDR কর্মীরা সেখানেও হাজির হন। ঐ দিনই বিকেলের দিকে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে উপস্থিত APDR কর্মীরা জানতে পারেন, পুলিশি সন্ত্রাসে আহত রাজকুমার নামে এক যুবক বাড়িতে আসার পর দুপুরের দিকে মারা গেছেন। আহত ও ধৃত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও আইনী অধিকার সুরক্ষার জন্য APDR সাধ্যমত সহায়তা করে ও একই সঙ্গে পুলিশি সন্ত্রাসের বিবরণ ও অন্যান্য তথ্যাদিও সংগ্রহ করে। পরে APDR তথ্যানুসন্ধানী দল কয়েকবার এলাকায় গিয়ে আহত ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

APDR-এর তথ্যানুসন্ধানের বিবরণঃ

১. পটভূমি—সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার শপথ নেবার দিনই সিঙ্গুরের এক হাজার একরেরও বেশী জমি টাটাদের হাতে মটরগাড়ি কারখানা তৈরীর জন্য দিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করে।

সরকার এই জমিকে এক ফসলা ও পতিত বলে বর্ণনা করলেও জানা যায় এই জমির প্রায় সবটাই উন্নত মানের বহুফসলা সেচ সেবিত কৃষিজমি। কয়েক হাজার কৃষক পরিবারের জীবিকার একমাত্র সম্বল জোর করে অধিগ্রহণ করার বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষিজীবী পরিবারগুলির মানুষেরা গত প্রায় চারমাস ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন। ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর মাঝরাতের ঘটনা তারই জের।

১৮ মে, ২০০৬-এ জমি নিয়ে নেবার কথা ঘোষণার প্রথম দিন থেকেই দল-মত নির্বিশেষে এলাকার প্রায় সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী এক সুদৃঢ় প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। গত চার মাস ধরেই প্রতিবাদ সভা বিক্ষোভ, মিছিল, ডেপুটেশন, ধরণা সহ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের সব রকম পদ্ধতি এই এলাকার দৈনিক ঘটনা হয়ে রয়েছে এবং এ গুলিতে প্রায় সমগ্র পরিবারই অংশ নিচ্ছেন।

জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকার ১৮৯৪ সালের দানবীয় 'জমি অধিগ্রহণ আইন' প্রয়োগ করছেন। এই ঔপনিবেশিক আইনটিকে রাষ্ট্রের 'বিশ্বায়নে'র পরিকল্পনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৯৯৪ সালে এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে যে আইনগত প্রতিকারের কোন রাস্তাই খোলা নেই। এই অবস্থায় অনমনীয় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ছাড়া এলাকার হাজার দশেক কৃষক পরিবারের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।

ক্রমশঃ এই আন্দোলন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে—রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশ প্রতিবাদে সামিল হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কৃষি উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ, কর্মসংস্থান ইত্যাদির উপর কি প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিতর্ক চলতে থাকে। এ সবকে কার্যত উপেক্ষা করে সরকার অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার আইনগত ধাপগুলি কার্যকর করা চালিয়ে যেতে থাকে। এ সব প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অসহযোগিতা ও বিরোধিতার ফলে প্রতিটি ধাপেই বিপুল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের আগেই জমি হস্তান্তরের সরকারী পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। বামপন্থী বলে পরিচিত একটি সরকারের এ সব কার্যকলাপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেও সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজ্য সরকারের এ ধরণের কার্যকলাপকে মানুষের জীবনের অধিকার, মর্যাদাসহ জীবনযাপনের ও জীবিকা অর্জনের অধিকার, 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়া ও তার ফলের অংশীদার হওয়ার অধিকার এবং সামাজিক পরিবেশ ও বসতির অধিকারের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ বলেই APDR দেখে এসেছে এবং প্রথম থেকেই এই গণ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীও নিয়ে আসছে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সরকার যাদের জমি 'অধিগ্রহণ' করা হচ্ছে তাঁদের জমির দাম বাবদ চেক দেবার কথা ঘোষণা করে। এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার জন্য ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলনরত কৃষকদের সংগঠন 'সিঙ্গুর কৃষি জমি রক্ষা কমিটি' অনির্দিষ্টকালের অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেয়।

২৪ ঘণ্টা অভুক্ত, তাই অবিলম্বে তাঁদের আইনানুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে বলেও দাবি জানায়। আই সি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

৮. এর পর APDR কর্মীরা চুঁচুড়া থানায় গেলে 'সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র অন্যতম আহ্বায়ক বেচারাম মান্না সহ আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা জনা পনের আটক ব্যক্তি অভিযোগ করেন যে গ্রেপ্তারের পর তাঁদের একটি ঘরে ঢুকিয়ে ঘর বন্ধকরে এস আই দেবাশীষ ঘোষের নেতৃত্বে বীভৎসভাবে মারধোর করা হয়। চুঁচুড়া থানা লক আপে আইনসম্মতভাবে ১০-১২ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকলেও ৪২ জন আটক ব্যক্তিকে এখানে রাখা হয়েছিল। আটক ব্যক্তিদের ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারী পরীক্ষার পর সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। চন্দননগর থানায় আটক মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে একজন চিকিৎসককে থানায় ডেকে আনা হয়। তিনি দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তির সুপারিশ করেন ও অন্যান্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন।

৯. পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ একাধিকবার স্বীকার করেছেন যে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং বিক্ষোভকারীরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিল। কিছু মহিলার সঙ্গে এখানকার বর্তমান আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক ঝাঁটা ছিল মাত্র। অথচ আটক পুরুষ-মহিলা সকলকেই পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা (হত্যার চেষ্টা) ও বিস্ফোরক পদার্থ আইনে অভিযুক্ত করে। স্পষ্টতঃই জামিন না দেওয়া ও আরো হয়রাণি করাই এর উদ্দেশ্য।

১০. APDR লক্ষ্য করেছে যে ২৮ সেপ্টেম্বরের সংবাদপত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, সিঙ্গুরে যা হয়েছে, তা মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রেত ছিল না। এ সব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী হিসেবে একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশি সন্ত্রাসের দায় এড়ায়ে চাইছেন, না তাঁর 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে' অন্য কেউ এ সব ঘটিয়েছে বলে ধারণা সৃষ্টি করতে চাইছেন, তা স্পষ্ট নয়।

১১. আহত অবস্থায় ও পুলিশি আক্রমণ থেকে যাঁরা পালাবার চেষ্টা করছিলেন, স্থানীয় সি পি আই (এম) অফিসের সামনে গোপালনগরের বিভাস ঘোষ সহ তাঁদের কয়েকজনকে আটকানো হয় ও মারধোর করা হয়। এখানে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে জানা গেছে জলাঘাটার জনৈক অমর চন্দ এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়।

১২. আহত ও পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে চাওয়া বহু মানুষকেই আশপাশের সাধারণ মানুষেরা আশ্রয় দেন ও শুশ্রুষা করেন—এদের মধ্যে সি পি এম সমর্থকরাও ছিলেন। সারারাত বাইরে থেকে এবং গ্রামগুলিতে পুলিশি সন্ত্রাস চলছে কি না জেনে নিয়ে ২৬ তারিখ দুপুর নাগাদ তাঁরা নিজ নিজ গ্রামে ফিরতে থাকেন। আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা গ্রেপ্তার হওয়া সহকর্মীদের কোথায়, কি অবস্থায় রাখা হয়েছে তার খোঁজখবরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সব কারণে এবং পুলিশি হামলার আশঙ্কায় গ্রামগুলি ছিল কার্যত সক্ষম পুরুষহীন।

১৩. গোপালনগর মধ্যপাড়ার বাসিন্দা দ্বারিকানাথ ভুল এবং তাঁর একমাত্র পুত্র রাজকুমার

ভুল সিঙ্গুর বি ডি ও অফিস চত্বরে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন এবং পুলিশের হাতে প্রহৃত হয়েছিলেন। দ্বারিকানাথ মধ্যরাত্রে কোনোক্রমে বাড়ি ফিরলেও রাজকুমার পারেনি। পর দিন, ২৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা নাগাদ কয়েকজন যুবক গুরুতর আহত অবস্থায় রাজকুমারকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। মাথা সহ সারা শরীরে তার অসহ্য যন্ত্রণা। স্নান করে খেয়ে বিশ্রাম নিলে যন্ত্রণা কমবে এই আশায় সে পুকুরের দিকে যেতে যায়। পুকুরে পৌঁছনোর আগেই রাস্তার পাশে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়। আসতে দেরী হচ্ছে দেখে বাড়ির লোক খুঁজতে গিয়ে তাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। তখন সময় ১১-৩০টা। স্থানীয় চিকিৎসক অরুণ রায় (রাঙা ডাক্তার—তাঁর প্রদত্ত ডেথ সার্টিফিকেটে নাম দেওয়া আছে সৌরীন্দ্র সিংহরায়, ডি এম এস) কে ডেকে আনা হয়। তিনি আসার কিছু পরেই কোনো চিকিৎসা করার আগেই রাজকুমারের মৃত্যু হয়। উপরোক্ত চিকিৎসকের দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ বলা হয়েছে *Cardio-Respiratory failure* এবং মৃত্যুর সময় উল্লিখিত আছে বেলা ১টা।

১৪. সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে APDR কথা বলতে চেয়েছিল, তা সম্ভব হয়নি। মনে হয়েছে তিনি তথ্যানুসন্ধানী দলটিকে এড়াতে চাইছিলেন। অবশ্য পরদিন তিনি APDR জেলা কেন্দ্রে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং রাজকুমারের মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেথ সার্টিফিকেটের বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেন।

১৫. ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে রাজকুমারের মৃত্যুর সময়ও গ্রামগুলি কার্যত ছিল জনশূন্য ও সক্ষম পুরুষহীন। বিভীষিকাময় রাত্রির শেষে অনেকে তখনও গ্রামে ফিরছে। গ্রেপ্তার হওয়া আত্মীয়--বন্ধুদের খোঁজে কেউ কেউ চন্দননগর বা শ্রীরামপুর গেছেন। বাকিরা দৈনন্দিন জীবিকার্জনের চেষ্টায় কর্মস্থলে। এর ওপর চারদিকে পুলিশের টহল ও হঠাত-হঠাতই ভ্যানভর্তি সশস্ত্র পুলিশের আবির্ভাব। সকালেই গতরাত্রে ঘটনার প্রতিবাদে বের হওয়া মহিলাদের এক মিছিলকে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। পুলিশি পাহারায় সি পি আই এমের একটি মিছিলও সন্ত্রাস ছড়িয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় দিশাহারা পরিবারটিকে রাজকুমারের এ রকম অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য কি আইনগত পদ্ধতি নেওয়া দরকার, তা বলে দেওয়ার মত কেউ ছিল না। পরিবার ডাক্তারের দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্যে শেওড়াফুলি হাতিশালা ঘাটে মৃতদেহ দাহ করে দেন। আরো ঝামেলা, পুলিশি হয়রানি এ সবের আতঙ্কে অন্য কিছু করার কথা তাঁরা ভাবতেও পারেননি।

১৫. রাজকুমারের শেষকৃত্যের সময় শ্মশানে ছিলেন ঐ পাড়ারই পিণ্টু ঘোষ ও শৈলেন ঘোষ। তাঁরা APDR-কে বলেছেন, রাজকুমারের ঠোঁটে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ ছিল। হিন্দু ধর্মীয় আচার অনুযায়ী যখন হাতিশালা ঘাটে রাজকুমারের মরদেহ দাহের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল হঠাতই বেশ খানিকটা রক্ত তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন বলেও তাঁরা APDR-কে বলেছেন।

১৬. APDR-এর জানা আছে যে, আত্মহত্যা, জলে ডোবা বা দুর্ঘটনা জনিত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মরদেহ পুলিশের কাছে যাওয়ার পর আত্মীয়-বন্ধুদের অকারণ হয়রান হতে হয়।

পোষ্ট-মর্টেমের জন্য মরদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ও ফেরৎ আনার বিশাল ব্যয়ভার এবং কাটাছেঁড়া করা মৃতদেহ সরকারী হাসপাতাল থেকে ছাড়াবার সময় যে বিপুল টাকা চাওয়া হয়, তা দেবার সামর্থ না থাকায় এবং হয়রানি এড়াতে বহু ক্ষেত্রেই, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে পালনীয় আইনগত বিধিগুলি মানা হয়না। স্থানীয় চিকিৎসকরাও বিভিন্ন কারণে এ রকম মৃত্যুর জন্য হৃদরোগে বা অন্যরোগে স্বাভাবিক মৃত্যু'র ডেথ সার্টিফিকেট দেন (অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক হত্যার ক্ষেত্রে বাধ্যও হন, এ অভিজ্ঞতা APDR-এর আছে)। এ ক্ষেত্রেও সে রকমই ঘটেছে এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

১৬. দ্বারিকানাথ APDR-কে এক লিখিত অভিযোগে বলেছেন, '**আমার চোখের সামনেই পাঁচ-ছ জন ছাপ ওয়ালা উর্দিপরা পুলিশ তাকে মাটিতে ফেলে অকথ্যভাবে লাঠিপেটা করে। পুলিশের আক্রমণে অনেকে এদিক-ওদিক চলে যায়। দু চার ঘা লাঠি খেয়ে আমি কোনোক্রমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। তারপর আর আমার ছেলেকে দেখতে পাইনি। পরদিন সকালে ১১টা নাগাদ আমার পুত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় কয়েকজন বাড়িতে পৌঁছে দেয়। আমি, আমার স্ত্রী মিনা ভুল ওঅন্যান্যরা দেখি তার সমস্ত শরীরে লাঠিপেটার দাগ।**' রাজকুমারকে চার-পাঁচজন পুলিশ মাটিতে ফেলে বেদম লাঠিপেটা করতে দেখেছেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রতিবেশী শৈলেন ঘোষ, রাজকুমারের কাকা ও অন্যান্যরাও।

১৭. রাজকুমারকে প্রহৃত হতে যাঁরা দেখেছেন এবং তার মৃত্যুর অব্যবহিত আগে তার শারীরিক অবস্থা যাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁদের বিবৃতি থেকে রাজকুমারের মৃত্যু যে ২৬ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে সিঙ্গুর বি ডি ও অফিস চত্বরে পুলিশি নির্যাতনের ফলেই হয়েছে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে APDR সহমত। সিঙ্গুরের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের সংগঠন 'সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'ও তাকে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদের মর্যাদা দিয়েছে।

সিঙ্গুর বিডিও অফিস চত্বরে ২৬ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে পুলিশি সন্ত্রাসের উপরোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে APDR এর দাবি ঃ

১। সিঙ্গুর বি ডি ও অফিস চত্বরে ২৬ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে পুলিশি সন্ত্রাসের অভিযোগগুলির বিষয়ে এবং গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের প্রতি পুলিশের আচরণের বিষয়ে রাজ্য পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, এমন কোনো নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে।

২। ২৬ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে সিঙ্গুর বি ডিও অফিস চত্বরে পুলিশি সন্ত্রাসের ফলে তাঁর পুত্র রাজকুমার ভুলের মৃত্যু হয়েছে বলে গোপালনগর মধ্যপাড়ার দ্বারিকানাথ ভুল যে অভিযোগ করেছেন সে বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুযায়ী একটি পৃথক তদন্ত করতে হবে এবং সেই তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। জনসমাবেশের উপর বলপ্রয়োগের আইন নির্দিষ্ট বিধি ও মানদণ্ড না মেনে সম্পূর্ণ বিপুল সংখ্যক মহিলাও শিশু সহ নিরস্ত্র ও মোটামুটি শান্তিপূর্ণ জমায়েতের উপর নির্বিচার

বলপ্রয়োগের নির্দেশদানকারী ও বলপ্রয়োগকারী পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫। যে সব মানুষ তাঁদের জীবিকার্জনের একমাত্র সম্বল থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদের বিরোধিতা করছেন এবং সংবিধান স্বীকৃত জীবনের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করছেন তাঁদের ভীতিপ্রদর্শন ও হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৬। গ্রেপ্তারের আগে ও তার পর গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের আইনী অধিকার সম্পর্কে নীচের আইনী সংস্থানগুলি ও সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশাবলী না মেনে চলার জন্য দায়ী পুলিশ আধিকারিকদের চিহ্নিত করতে হবে ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ঃ

(ক) কোনো মেমো অফ অ্যারেষ্ট দেওয়া হয়নি।

(খ) গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ আধিকারিকরা নিজেদের নাম ও পদমর্যাদা সূচক ব্যাজ পরে ছিলেন না।(ফলে নির্যাতন ও বিশেষ করে শ্লীলতাহানির সঙ্গে যুক্ত পুলিশদের চিহ্নিত করা যায়নি।)

(গ) অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের কোথায় নিয়ে যাওয়া বা রাখা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

(ঘ) লক আপ রেজিষ্টারে নথিভুক্ত না করেই গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের দীর্ঘসময় লকআপে রাখা হয়েছে।

(ঙ) লক আপে ঢোকানোর আগে আহত ব্যক্তিদের মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়নি এবং নারী-শিশু সহ তাদের দীর্ঘসময় রক্তাক্ত অবস্থায় বিনাচিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছে।

৭. পুলিশি সন্ত্রাসে নিহত রাজকুমার ভুল সহ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। রাজকুমার ভুলের ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নীলাবতী বেহারা বনাম উড়িষ্যা রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট নির্ধারিত পরিমাণ দু'লক্ষ টাকার কম হবে না। ❑

৮ অক্টোবর ২০০৬ — অশোক দেবরায়, সম্পাদক — অমিতদ্যুতি কুমার, সভাপতি

পুত্রহারা পিতার যে অভিযোগের কোনো বিচার মেলেনি

পুলিশি নির্যাতনে পুত্র রাজকুমার ভুলের মৃত্যুর বিষয়ে দ্বারিকানাথ ভুলের অভিযোগপত্র

APDR
4/10/06

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ·
হুগলী জেলা কমিটি
সেনপাড়া, বুড়োর শিবতলা, চুঁচুড়া

মহাশয়,

আমি দ্বারিকা নাথ ভুল, ঠিকানা - গোপাল নগর মল্লিপাড়া, থানা - সিঙ্গুর, আমার একমাত্র পুত্র রাজকুমার ভুল, বয়স 24, গত 25/26 sep মাঝরাতে সিঙ্গুরে কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলনে শান্তি পূর্ণ অবস্থানে অংশ নিয়েছিল, অকস্মাৎ আলো নিভিয়ে পুলিশ বাহিনী ঐ অবস্থানে নৃশংস আক্রমণ করে, আমার চোখের সামনে পাঁচ ছ'জন ছাপওলা উর্দি পরা পুলিশ তাকে মাটিতে ফেলে অকথ্য ভাবে লাঠি পেটা করে, পুলিশের আক্রমণে সকলে প্রাণ নিয়ে চলে যায়, অনেককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরদিন সকাল ১১টা নাগাদ আমার পুত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় কয়েকজন বাড়িতে পৌঁছে দেয়, আমি, আমার স্ত্রী মিনু ভুল ও অন্যান্যরা দেখি তার সমস্ত শরীরে লাঠি পেটার দাগ, পুলিশী সন্ত্রাসে গ্রামে কোন সমর্থ মানুষ না থাকায় আমরা কি করব ভেবে পাইনি, আহত অবস্থাতে সে সকালে উদ্দেশ্যে পুকুরের দিকে যাবার পথে মারা যায়, তার মৃতদেহ বা তার মৃত্যুর খবর আমরা আতঙ্কে কাউকে জানাতে পারিনি, স্থানীয় একটি ডাক্তার তার মৃত্যু জনিত সার্টিফিকেট দিলে আমরা তার শবদেহ ১০.৩০ [illegible] শ্মশানে দাহ করি।

[illegible]

...উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আমরা আপনার কাছে দাবী জানাচ্ছি।

অত্যন্ত দুঃখ শোকে এবং [illegible] না থাকায় এই আবেদন করতে দেরি হল।

আশা করি আমার আবেদনের ব্যাপারে অতিসত্বর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন। আমি লেখাপড়া না জানায় আমার গ্রামের একজন প্রতিবেশী আমার মুখে শুনে এই আবেদন লিখে দিয়েছে।

L.T.I OF Dwarika Nath Bhul

4.10.06

প্রতিলিপি অনুলিপি দেওয়া হল
১) মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ
২) [illegible] পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার
৩) জেলা শাসক হুগলী

রাজকুমার ভুলের বাবার অভিযোগপত্র টি এ পি ডি আর এর তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট এবং এ পি ডি আর-এর একটি অভিযোগপত্র (No. 292/2006 dated 12.10.2006) সহ ১২ অক্টোবর একটি প্রতিনিধিদল জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে দিয়ে আসে। তাঁরা উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দিন সাতেকের মধ্যে তদন্ত করে প্রশাসন এই অভিযোগের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিলেন, তা জানাবেন। একাধিকবার দরবার করেও এই ‘তদন্তের’ কোনো ফলাফল জানা যায়নি।❒

গত ২৭ অক্টোবর ২০০৬ সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি ও **সংহতি** উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় সিঙ্গুরের গোপালনগর দুর্গাবেদী প্রাঙ্গণে একটি জনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এই জনশুনানির বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন মেধা পাটকর, মহাশ্বেতা দেবী, বিচারক মলয় সেনগুপ্ত ও দীপঙ্কর চক্রবর্তী। জনশুনানির পরই শুনানিস্থলে সাংবাদিক সম্মেলনে ও পরে বাজেমেলিয়া হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক জনসভায় বিচারকগণ তাঁদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দেন। কুলপি, বারুইপুর, কাটোয়া, হরিপুর, আসানসোল সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্য যে সমস্ত জায়গায় জনসাধারণ অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদের মুখে সে সব জায়গার জনসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য গড়ে ওঠা সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের অনেকেই জনশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানির পরও বিচারকগণ মন্ত্রী, সরকারি কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের সঙ্গে সাক্ষাতকার, সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন নথিপত্র পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যান। গত ৮ ডিসেম্বর, '০৬ কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নীচের তদন্ত রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়।

সিঙ্গুরে জনগণের সংগ্রামের উপর জনশুনানি ও পরবর্তী তদন্ত —একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট

❒ পটভূমি

সিঙ্গুর এলাকাটি কৃষক অধ্যুষিত একটি অত্যন্ত ঘনবসতি অঞ্চল, বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে ৪০ কিলোমিটারের বেশি দূর নয়। ভারতে অন্য সব গ্রামাঞ্চলের মতই এখানকার বাসিন্দারা অনেক প্রজন্ম ধরে এখানে বাস করছেন। তাঁরা নানাধরনের কাজ করেন। কৃষক, কৃষিমজুর, হস্তশিল্পী, আবার ছোট ব্যবসাদার ও অন্যান্য স্বনিযুক্ত ব্যক্তিরা আছেন এখানে, আছেন স্থানীয় ও বাইরে থেকে আসা মজুররা।

সারা দেশে বড় সব শহর, বিশেষ করে মহানগরীগুলির চারপাশে যেমন হয়, এখানেও এসেছে পরিবর্তনের হাওয়া) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক) বছর ও দশকের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলের সম্পদের পুনর্বন্টন ঘটেছে, জমি ব্যবহারের ধরন বদলেছে। মানুষ স্বেচ্ছায় চাকরি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার সন্ধানে কলকাতা ও তার কাছাকাছি চলে যাওয়ার কারণেই শুধু নয়, এই বদল ঘটেছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ করার অথবা কিনে নেওয়ার কারণে এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারাও নানান অ-কৃষি বাণিজ্যে জমি (কিনে) নেওয়ার কারণে। পরিবর্তনের এই সব প্রক্রিয়া যতক্ষণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকে ততদিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও, ভেতরে অসাম্য ও বাইরের নানান টানাপোড়েন সত্ত্বেও, বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে সহনশীলতার সীমার মধ্যে থাকলে এই

রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে তেমন কোনও বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হয় না।

নবনির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েই শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন ঘোষণা করলেন যে সিঙ্গুরের গোপালনগর, বেড়াবেড়ি, বাজেমেলিয়া, খাসেরভেড়ি, সিংহেরভেড়ি গ্রামে ব্রিটিশ জমি অধিগ্রহণ আইন(১৮৯৪)-এর বলে তিনমাসের মধ্যে প্রায় ১০০০ একর জমি নেওয়া হবে টাটাদের সস্তা মোটর গাড়ি কারখানার জন্য, তখন থেকেই সিঙ্গুরে সরকার কর্তৃক জমি নেওয়া নিয়ে বিবাদের সূচনা হয়। সিঙ্গুর ও কলকাতা থেকে আসা খবরে সবাই জানতে পারছিলেন যে স্থানীয় কৃষক ও মজুররা, বিশেষত মহিলারা, স্থির করেছেন যে তারা এর প্রতিবাদ করবেন। তাঁদের জমি তাঁরা দেবেন না, বরং কোম্পানির লোকেদের তাড়িয়ে দেবেন, সরকারি আধিকারিকদের আসতে দেবেন না। ধর্ণা, সভা, ধর্মঘট, অনশন ও আরো নানা রূপে আন্দোলন করতে থাকেন বিপন্নতার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয় মানুষ। মানবাধিকার রক্ষার বিভিন্ন সংগঠন, গণতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে কর্মরত বিভিন্ন গণসংগঠন এবং ছোট বড় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস ও সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার (এস ইউ সি আই), তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ফোরামে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করে। টাটার আধিকারিকরা এলাকা দেখতে এলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও তাঁদের মাথার উপর খাঁড়া ঝুলতেই থাকে, বিবাদ আরো গভীর হয়, কোনও সমাধান হয় না।

এই পরিস্থিতিতে, দুই পক্ষই যখন তাদের পথে চলতে দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন, সিঙ্গুরের আক্রান্ত মানুষদের গণসংগঠন 'কৃষি জমি বাঁচাও কমিটি' ও 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি'র (এ পি ডি আর) মত দীর্ঘ দিন কাজ করে আসা কিছু গণতান্ত্রিক সংগঠন স্থির করে যে সিঙ্গুরে একটা জনশুনানি হবে, আর সে জন্য তারা প্যানেল সদস্য হিসাবে আমাদের আমন্ত্রণ জানায়। এই প্রস্তাবে ২৭ অক্টোবর, ২০০৬ গোপালনগর গ্রামে এই জনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গুরের কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের তোলা বিষয়গুলি সম্পর্কে এবং এদেশে শিল্পায়ন থেকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এস ই জেড) বর্তমান ধরন নিয়ে মতাদর্শগত বিতর্ক বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এবং সম্ভব হলে বিবাদ মেটানোর ইচ্ছায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

❒ শুনানি

আমরা, প্যানেলের সদস্যরা, এই জনশুনানির উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনার জন্য উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির সঙ্গে বসি এবং আলোচনার পর তদন্তে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে বলে স্থির করা হয়

১. সাধারণভাবে সিঙ্গুর ব্লকের এবং বিশেষ ভাবে টাটা মোটরের কারখানার কারণে বিপন্ন হচ্ছে যেসব গ্রাম/জনসমাজ সেগুলির প্রস্তাবিত সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্র কী?
২. টাটা মোটর প্রকল্পে কী আছে— তার উৎপাদন পরিকল্পনা, অর্থনীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

সরকারের কাছে তার প্রস্তাব কী? সরকারের সঙ্গে তার কী মউ (Memorandum of Understanding) বা অন্য চুক্তি হয়েছে?

৩. প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া কীরকম, কতটা স্বচ্ছ, সবার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তা হয়েছে কিনা? প্রকল্পে-বিপন্ন মানুষদের সম্মতি চাওয়া হয়েছিল কিনা।

৪. টাটা-প্রকল্প সম্পর্কে, সরকারের ভূমিকা নিয়ে, জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এবং এখনো পর্যন্ত যে প্রক্রিয়া চলেছে তা নিয়ে সাধারণ মানুষের— কৃষক, মজুর ও প্রকল্পে-বিপন্ন অন্যদের ধারণা কী?

৫. জনগণের সংগ্রামের উপর কি সরকারি নিপীড়ন হয়েছে? হয়ে থাকলে, তা কতটা যুক্তিযুক্ত?

৬. এই প্রকল্প কি সিঙ্গুরের মানুষের জন্য উন্নততর জীবন আনতে পারবে? যে সুবিধা পাওয়া যাবে তাতে এদের অংশ কতখানি থাকবে? জমি ব্যবহারের সরকারিভাবে ঘোষিত নীতি কী? পুনর্বাসন নীতি ও পরিকল্পনা কী?

৭. বামফ্রন্ট সরকার ও তাদের দলগুলি এই প্রকল্পকে ও জনগণের আন্দোলনকে কীভাবে দেখছেন? এই সংগ্রামের ও সরকারের প্রতিক্রিয়ায় নিহিত রাজনীতি কী?

৮. পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যত্র ভবিষ্যত শিল্পায়নের জন্য সংগ্রামে সিঙ্গুর প্রকল্পের তাৎপর্য কী?

৯. পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে?

২৭ অক্টোবর, ২০০৬ গোপালনগর গ্রামে একটা খোলা মাঠে এই জনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পে বিপন্ন বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ সেখানে ভীড় করেছিলেন, নানা ধরনের গণসংগঠন থেকে আগত বহু কর্মীও জড়ো হয়েছিলেন সেখানে। মুখ্যমন্ত্রী, শ্রম, কৃষি ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিক-সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিদের জন্য আসন রাখা ছিল। তাদের কেউ আসেন নি, শুনানির পুরো সময় জুড়ে তাদের জন্য রাখা আসনগুলি শূন্য ছিল।

'কৃষি জমি রক্ষা কমিটি'র সমর্থক 'সংহতি উদ্যোগ' ও 'এ পি ডি আর'-এর বরিষ্ঠ কর্মী অমিতদ্যুতি কুমার একটি স্বাগত ভাষণ ও ভূমিকায় এই জনশুনানির উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন। তারপর স্থানীয় বাসিন্দাদের বলতে দেওয়া হয়। তাঁদের বক্তব্য রাখা শুরু হয় আন্দোলনের নেতৃত্বকারী সংগঠন কৃষি জমি রক্ষা কমিটির নেতা বেচারাম মান্নার রাখা একটি সামগ্রিক বক্তব্য দিয়ে। স্থানীয় মানুষরা কথা বললেন বেশ গুছিয়ে, বর্ণনা দিলেন পরিষ্কারভাবে। তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল একটা দৃঢ়তা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, আবার দুঃখ ও যন্ত্রণা। এদের মধ্যে ছিলেন একক বা যৌথ জমি-মালিক, নথিভুক্ত ও অ-নথিভুক্ত বর্গাদার, খেতমজুর ও অন্যান্য স্বনিযুক্ত ব্যক্তি। কিছু সমাজকর্মী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী তাদের সঙ্গে যোগ দেন। (বক্তাদের নামের তালিকা ও প্যানেলের কাছে তাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যাবে নির্মীয়মান সম্পূর্ণ রিপোর্টটিতে)।

এখানে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত তথ্য বেরিয়ে এল তার মধ্যে আছে নিম্নলিখিতগুলি—

১. টাটা মোটরের এই (সস্তা ছোট গাড়ি তৈরির) প্রকল্পের জন্য অধিগৃহীত ও ধ্বংস হতে চলা এই ১০০০ একর জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে জীবন নির্বাহ করেন ১০,০০০-এর বেশি পরিবার। এদের মধ্যে আছেন প্রায় ৬০০০ কৃষিজীবী মানুষ— মালিক-কৃষক, নথিভুক্ত বর্গাদার, অ-নথিভুক্ত বর্গাদার। এই এলাকায় অনেক পুরুষ ধরে বাস করেন আরো সব মানুষ— ভূমিহীন কৃষক, হস্তশিল্পী, ছোট ব্যবসাদার। আরো আছেন বাইরে থেকে আসা কয়েক হাজার খেতমজুর, যারা নিয়মিত চাষের সময় কাজের জন্য এখানে আসেন— এই সম্পদের উপর যাঁদের জীবন নির্বাহ হয়।

২. অনেক বছর ধরে জমির রেকর্ড, জমির মালিকানার রেকর্ড ঠিক করা হয় নি, ঠিক মত করা হয় নি মিউটেশনের কাজও। দু একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সরকার যদিও আইন অনুযায়ী বেসরকারি শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ২০ বছর বা তারও আগেকার জমি কেনাবেচার রেকর্ড ঠিক করে ক্রেতার নামে নথিভুক্ত করা হয় নি। (এর ফলে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা দেখা দিচ্ছে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।)

৩. যে জমি নেওয়া হচ্ছে তা উচ্চমানের বহুফসলি কৃষি জমি। সে জমিতে ধান, পাট, নানা ধরনের সব্জি ফলে। ঐ হাজার হাজার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হয় তা দিয়ে।

৪. সরকার যে দাবি করছেন যে অধিকাংশ জমি পতিত বা একফসলি জমি, সেকথা ডাহা মিথ্যা। সামান্য কিছু অংশে জলা জমি আছে।

৫. রাজধানী কলকাতার কাছে অবস্থিত হওয়ার কারণে, সেখানে স্থায়ী ও অস্থায়ী কাজের সুযোগ পান কেউ কেউ, কিন্তু প্রায় সবারই জীবিকা নির্বাহের মূল উপায় এই জমি, যা নিতে চাওয়া হচ্ছে।

৬. জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ পুরোপুরি আইনিভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে না, ঐ প্রকল্পটি কেন জনস্বার্থ প্রকল্প বলে বিবেচনা করতে হবে তার সম্পূর্ণ তথ্যও দেওয়া হচ্ছে না। অনেকেই, জমি মালিকদের ৫৪-৬০ শতাংশ, নোটিশ গ্রহণ করেন নি, (জমি দিতে) রাজিও হন নি।

৭. ৬ মার্চ, ২০০৬ তারিখের সাম্প্রতিক নোটিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন সময়ে জমি অধিগ্রহণের একটি আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিঙ্গুরেও সেটাই (সরকারের) পথ বলে মনে হচ্ছে।

৮. জমি অধিগ্রহণ আইন ও উপরোক্ত নোটিশ অনুসাবে যে পদ্ধতি হওয়া উচিত, সে পদ্ধতিও ঠিকমত পালন করা হয়নি। গ্রামের মানুষের কাছে ৪নং ধারার নোটিশ ঠিকমত পৌঁছে দেওয়া হয়নি, কোনও জনশুনানিও হয় নি, ঐ নোটিশ অনুযায়ী /জমি অধিগ্রহণের সম্পূর্ণ প্রস্তাব* দেওয়া হয় নি।

৯. শুধু টাকার অংকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, কারণ রাজ্য স্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও পুনর্বাসন প্রকল্প নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে অনেক টাকা (একর পিছু ১২ লক্ষ টাকা), কিন্তু সিঙ্গুর অঞ্চলে জমির বাজার দরের চেয়ে এই টাকা কম; সিঙ্গুরে জমির বাজারদর কাঠাপিছু ৪০ হাজার টাকা, অর্থাৎ একর প্রতি ২৪ লক্ষ টাকা।

১০. বাইরে বসবাস করা জমির মালিক, যারা মোট জমি মালিকদের ৩০ শতাংশের বেশি নন, তারা ছাড়া অন্য মালিকরা (মোট মানুষদের ৫০ শতাংশের মত) জমি দেওয়ার বিরোধী। কারণ তাঁরা মনে করেন, তাঁদের এই সুফলা প্রাকৃতিক সম্পদ অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সহজ নয়; পূর্বতন প্রকল্পগুলিতে যাদের সরে যেতে হয়েছে তাঁদের অবস্থা কী করুণ হয়েছে তা জানেন তাঁরা।

১১. জমি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাঁদের মত নেওয়া হয় নি, প্রকল্পটি সম্পর্কে, তার প্রয়োজন কী, তার জন্য কী ব্যয়ভার বহন করতে হবে, আর কী সুবিধা পাওয়া যাবে, কী চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়েছে অথবা কোন্ যুক্তিতে এটা করা হচ্ছে, এর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব কী হবে, সে সম্পর্কে তাঁদের জানানো হয় নি। এজন্য গ্রামবাসীরা খুব ক্ষুব্ধ।

১২. স্থানীয় কৃষক নেতারা এবং এ পি ডি আর-এর মত সংগঠন (প্রকল্পটি সম্পর্কে) তথ্য ও দলিল দাবি করে যেসব চিঠি বিধিসম্মত পদ্ধতিতে দিয়েছেন, তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ সত্ত্বেও সেগুলির কোনও উত্তর দেওয়া হয় নি; এটা আইনবিরুদ্ধ। (ঐ চিঠিগুলির একটি, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা, পরিশিষ্টে দেওয়া হল)।

১৩. মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, জমি বা কৃষিকে ধ্বংস করে, সাধারণ মানুষের জীবিকা নষ্ট করে একটি মোটর গাড়ি কারখানা বা অন্য কোনও শিল্প করা যায় না, তাঁরা এটাকে কৃষকদের উপর আক্রমণ বলে মনে করছেন— যে কৃষকরা এমনিতেই সারা দেশেই বিপন্ন, ঋণগ্রস্ত— সিঙ্গুর না হলেও অন্যত্র আত্মহত্যা করছেন তাঁরা।

১৪. কৃষির চেয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারে না এই প্রকল্প। শিল্প তৈরি করা উচিত পতিত জমিতে, অথবা ইতিমধ্যেই অধিগৃহীত অব্যবহৃত জমিতে। অনেকেই সিঙ্গুরের জমির বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন, যার মধ্যে আছে সিঙ্গুরের আশপাশের পতিত জমি— যেমন ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান মোটরস্-এর (বিড়লাদের) অব্যবহৃত জমি, যে জমি অধিগৃহীত হয়েছিল ৭৪১ একর, আর এ পর্যন্ত তারা ব্যবহার করেছে মাত্র ৩৯১ একর— এই সব বিকল্পের কথা বলেন অনেকে। এভাবে অন্তত ৩৫০ একর জমি পাওয়া যাবে, যা মূল কারখানার জন্য যথেষ্ট। অফিসারদের বাসস্থান-সহ সব পরিকাঠামো ভার যদি কমানো হয়, একই প্রাঙ্গণে না হয়, তবে কারখানাটি গড়তে ১০০ থেকে ৫০০ একর জমি লাগবে বলে বলে হিসাব করা হয়েছে। এছাড়াও অন্য জেলায়, যেমন পুরুলিয়ায়, যেখানে মানুষকে উৎখাত না করে বা তাদের সম্মতি নিয়ে জমি পাওয়া সম্ভব, সেসব জায়গার কথা ভাবা

যেতে পারে। মানুষ বিশ্বাস করেন যে, টাটা বা বড় বড় কোম্পানিগুলি এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকাবের ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে উঠেছেন, বিশেষ করে চাষবাস করা বা মাছ চাষ করা মেহনতি মানুষের প্রতি তারা আর দায়বদ্ধ নন, স্বচ্ছ নন।

১৫. টাটা ও সরকারের মধ্যে যে গোপন চুক্তি হয়েছে তার পেছনে আছে পারস্পরিকবিনিময়, যার মধ্যে অর্থের বিনিময়ও আছে— এটা সংবাদমাধ্যম বলছে, মানুষও সেকথা বলছেন। সরকারের পরিবর্তিত অবস্থান শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের টাটাদের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যে দিয়ে যা প্রতিফলিত—তাকে প্রকাশ করাকে ধিক্কার ও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়।

১৬. ২৫ সেপ্টেম্বরের, ২০০৬ তারিখের অপ্রয়োজনীয় নিপীড়নে মানুষ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। সেদিন কৃষক ও মজুররা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, তাঁরা (সরকারি) আধিকারিকদের ঘেরাও করেছিলেন, কিন্তু হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়নি। সেদিনের (পুলিশি) আক্রমণের পর মারা যান রাজকুমার ভুল— মানুষ রাজকুমার ভুল হত্যার জন্য খোলাখুলিভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে ধিক্কার জানান। আক্রান্ত মানুষদের উপর যেসব মিথ্যা মামলা চাপানো হয়েছে মানুষ তাকে চ্যালেঞ্জ জানান।

১৭. নিরীহ নারী-পুরুষ, এমন কি আড়াই বছরের এক শিশুর উপর পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে, গ্রামবাসী ও তাঁদের সমর্থকরা তাতে ক্ষুব্ধ, এ নিয়ে প্রশ্ন করছেন তাঁরা।

১৮. এই প্রকল্পে বিপন্ন পাঁচটি গ্রাম, গোপালনগর, বাজেমেলিয়া, বেরাবেরি, খাসের ভেড়ি ও সিংহের ভেড়ি-র যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পূর্ণ রিপোর্টটিতে দেওয়া হবে।

১৯. পরিকল্পনাকাররা এই প্রকল্পের সমস্ত তথ্য পঞ্চায়েতকে জানান নি, তাদের সঙ্গে আলোচনাও করেন নি বলে সমালোচনা করেন বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্য শ্রীদুধকুমাব ধাড়া। তাঁর মৌজা বেড়াবেড়ির ৮২৭ বিঘার প্রায় সবটাই অধিগৃহীত হবে, পড়ে থাকবে শুধু ৫ একর, ফলত মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাবেন, হিংসাত্মক ঘটনা বাড়বে—একথা বলতে গিয়ে তাঁকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল। তিনি আরও বলেন, গত ৩০ বছর ধরে জমি হস্তান্তরের কোনও রেকর্ড নেই, তাই অধিগ্রহণ পদ্ধতিও সঠিক হচ্ছে না, নতুন করে না দিলে এমনকি অনেক অনুপস্থিত জমি-মালিকের নেওয়া চেক ভাঙানোও যাবে না। চাষের জমি হিসাবে ব্যবহৃত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জমিও ধ্বংস করার পরিকল্পনায় মানুষ স্তম্ভিত।

২০. শুনানিতে অংশগ্রহণকারী অনেকে জানেন যে, অন্য রাজ্যে বামফ্রন্টের এ নিয়ে অবস্থান আলাদা, আর এখানে তারা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়তে হচ্ছে।

২১. সমস্ত কৃষক, (কৃষি) মজুর ও হস্তশিল্পীরা যে টাটার মোটর কারখানায় কাজ পাবেন না, সরকারি বক্তব্যেও সে কথাই বলা হয়েছে— এ নিয়ে মানুষের ধারণা খুব পরিষ্কার।

❏ সরকারি দৃষ্টিভঙ্গী

সরকারের কোনও প্রতিনিধি, মুখ্যমন্ত্রী, অন্য কোনও মন্ত্রী, এমনকি পদস্থ কোনও আধিকারিকও

এই জনশুনানিতে যোগ দেন নি, তাই দায়িত্বশীল কোনও একজনের কথা শোনার প্রয়োজন দেখা দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাইনি আমরা, কিন্তু শিল্পমন্ত্রী শ্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করি।

তাঁর ও পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দু ঘন্টা ধরে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়। প্রকল্পের প্রধান দিকগুলি নিয়ে একটা সারসংক্ষেপ তিনি আমাদের দেন। আরও অন্য সব কথার মধ্যে তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলিও বলেন—

ক) আমাদের সঙ্গে আলোচনার আগে মন্ত্রীমহোদয় খোলাখুলি বলেছিলেন যে, এটা একটা ট্রেড সিক্রেট। আর আমরা তথ্য জানার অধিকার আইন,২০০৫-এর কথা বলা সত্ত্বেও তিনি আমাদের জানান যে, সব দলিল প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যা যা সম্ভব সেগুলি আমাদের দিতে স্বীকার করেন তিনি, যদিও আজ পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি।

খ) কত জমি প্রয়োজন সেটা তাঁরা অন্য মোটর গাড়ির কারখানার সঙ্গে তুলনা করে দেখেছেন— সিঙ্গুরে যে পরিমাণ জমি চাওয়া হয়েছে সেটা একেবারে সঠিক।

গ) মানুষকে বাস্তুচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচাতে তাঁরা কিছু জমি বাদ দিয়েছেন।

ঘ) এখনই তাঁদের কোনও পুনর্বাসন প্যাকেজ নেই, কিন্তু তাঁরা পরিকল্পনা করছেন।...টাটাদের সঙ্গে আলোচনা ও দরকষাকষি চলছে।

ঙ) এখনই বলার মত রাজ্যস্তরে কোনও পুনর্বাসন নীতি নেই।

চ) তাঁরা জানেন যে, পুরনো রেকর্ডে যেমন দেখানো হয়েছে তেমন পতিত জমি নয় ওটা, বেশির ভাগটাই বহুফসলি জমি। কারখানায় কাজ করার জন্য যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাদের একটা তালিকা তৈরি করেছেন তাঁরা এদের টাটারা কাজ দেবে, কিন্তু এ নিয়ে কোনও লিখিত গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না।

ছ) কোনও প্রকৃত প্রতিরোধ নেই। প্রায় সবাই রাজি হয়েছেন (জমি দিতে), জমি অধিগ্রহণ হয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকার চেক বিলানো হয়ে গেছে। জমির রেকর্ড ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে টাকা দেওয়ার কাজও চলছে। মিউটেশন নিয়ে অভিযোগ থাকার কারণে কোথাও কোথাও টাকা দেওয়ার কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে।

জ) বহিরাগতরাই ঝামেলা পাকাচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ কোনও লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটেনি, বরং কিছু লোক আক্রমণ করে, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা অফিসারদের আটকে রাখে, ফলে অ্যাকশন করতেই হয়। আমাদের পুলিশ ব্যবহার করতে হবে না, কারণ মানুষ (জমি দিতে) রাজি, যে দাম দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁরা খুশি।

ঝ) আমরা জানি দারিদ্র্য কী, জানি যে জিডিপি বৃদ্ধির জন্য, প্রবৃদ্ধি ও চাকরির জন্য আমাদের শিল্প দরকার। শুধু চাষের উপর নির্ভর করে মানুষ বাঁচবেন না।

ঞ) আমরা যদি টাটাদের পছন্দমত জমি দিতে স্বীকৃত না হই তারা অন্য রাজ্যে চলে যাবে।

এটা আমরা করতে পারি না। আমরা খড়গপুরে জমির কথা বলেছিলাম, ওরা রাজি হয় নি। সস্তা গাড়ি উৎপাদনের অর্থনীতির যে হিসাব করেছে ওরা, তাতে ওরা চায় পরিকাঠামো-সহ জমি, ওরা চায় কলকাতার কাছের জমি। কোনও বিকল্প ছিল না।*

ট) পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের জন্য বহুফসলি কৃষিজমি আমাদের নিতেই হবে, না নিলে এরাজ্যে শিল্পায়ন হবে না।

ঠ) এটার জন্য আমরা অনেক খেটেছি, এটা আমরা ছাড়তে পারব না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও এর পক্ষে।

ড) আমরা একটা বিশ্বায়িত, উদারনৈতিক অর্থনীতিতে বাস করছি। অবস্থা পাল্টে গেছে। এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে আমাদের।

বামফ্রন্টের বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন লিখিত ও খোলাখুলি দেওয়া বিবৃতি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি আমরা। সিপিআই (এম) নেতাদের অনেকে পিপলস্ ডেমোক্রাসি-তে শ্রীবিনয় কোঙারের লেখা প্রবন্ধের কথা বলেন। ঐ লেখাটি ভাল করে বিশ্লেষণ করা দরকার, কারণ অনেকের কাছেই, আমাদের কাছেও, লেখাটি ভয়ানক আপত্তিকর মনে হয়েছে। লেনিনের বিপ্লবোত্তর নয়া অর্থনৈতিক নীতির রাস্তায় পুঁজিপতিদের সঙ্গে সমঝোতার কথা যা বলা হয়েছে তা নিয়ে এই রিপোর্টে নয়, মতাদর্শগত কোনও ফোরামে বিতর্ক করা যেতেই পারে।

টেলিফোনে কথা বলার সময় (২ ডিসেম্বর রাতে) মুখ্যমন্ত্রী এই মত প্রকাশ করেন যে, জনগণের ভালমন্দ, তাদের সুবিধা দেখার ব্যাপারটা তাঁর ও তাঁর সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। তিনি জানেন দারিদ্র্য কী, মানবাধিকার কী। মানুষ (জমি দিতে) রাজি হয়েছেন, জমি হারাবেন যারা, তাদের মাত্র ১ শতাংশ প্রতিরোধ করছে। এই সংগ্রাম রাজনৈতিক ও সংবাদমাধ্যমে প্রচার পাওয়ার জন্য। তিনি তাই এতে সাড়া দেওয়ার কিছু পাচ্ছেন না। পুলিশ আনা ও ১৪৪ ধারা জারি করা সম্পূর্ণ সঠিক, যখন ৩০ নভেম্বর, ২০০৬ তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিআই(এম) একই দিনে মিটিং করতে চায় তখন এগুলি করতে হয়। ২ ডিসেম্বর কোনও পুলিশি অত্যাচার হয় নি, কিন্তু নকশালরা বিক্ষোভকারীদের ঘিরে রেখেছিল।

অন্য যে সব অসামঞ্জস্য দেখা গেছে সেগুলি নিম্নরূপ—

১. অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদের সন্নিহিত অঞ্চলের বহু জমি কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতি ও বড়লোকদের দেওয়া হচ্ছে, প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না— এই অভিযোগ তুলে সেই রাজ্যের সিপিআই(এম) সম্পাদক ও পলিটবুর্যে সদস্য সমস্ত তথ্যসম্বলিত 'শ্বেতপত্র' প্রকাশের দাবি তুলেছেন।

২. কানপুরে (১৫ অক্টোবর, ২০০৬) সংযুক্ত কিষান সভা (আর এস পি-র গণসংগঠন) সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিভিন্ন রাজ্য সরকার বড় বড় কর্পোরেশনগুলির জন্য বহুফসলি জমি নিতে শুরু করেছে... বামপন্থীদের কেউ কেউও উদারনীতির প্রবক্তাদের মতানুসারে শিল্প বিকাশের

নীতি মেনে চলার প্রয়াস করছেন... (এতে) কৃষির অবস্থা অবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়ছে।

৩. বামফ্রন্ট সরকারের সব শরিক দল-সহ বামপন্থী দলগুলি ইউ পি এ সরকারকে দেওয়া এক নোটে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এস ই জেড) আইনের পুনর্মূল্যায়ন করতে বলেছেন, কিছু কিছু পদক্ষেপ প্রবর্তিত করতে বলেছেন, যেমন (ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জমি পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া চলবে না, লিজে দিতে হবে; (খ) এস ই জেড নির্মাণ করতে হবে অ-কৃষি জমিতে; (গ) ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখের প্রেস নোটে বলা হয়েছে জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধন করতে হবে, মালিক-কৃষক ছাড়াও খেতমজুরদেরও উৎখাত হওয়া হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

দুঃখের বিষয়, সিঙ্গুরে এর কোনওটাই মানা হয় নি।

❐ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

সিঙ্গুর অঞ্চল টাটা মোটরের হয়ে জোর করে চাষের জমি দখলের ব্যাপারেপশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্ধত ও একগুঁয়ে রয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পুলিশ ও প্রশাসন— সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজকর্ম থেকে পরিষ্কার যে, শান্তিপূর্ণ গ্রামবাসী ও প্রতিবাদকারীদের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের জায়গা না দিয়ে তারা সংগ্রামকে হিংসার পথে ঠেলে দিচ্ছে। এতে সক্রিয় বিভিন্ন জনের সাক্ষ্য থেকে, বামফ্রন্ট সরকারের বিবৃতি থেকে, এবং আন্দোলন স্থানে যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে তা দেখে, এবং বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যেও মেহনতি জনতার অধিকার স্বীকার করা ও তাকে সম্মান জানানোতে এমন সম্পূর্ণ অনীহায় আমরা ব্যথিত, স্তম্ভিত। শান্তিপূর্ণ, অহিংস সমাজকর্মীদেরও সিঙ্গুর অঞ্চলে যেতে না দিয়ে গ্রামগুলিতে ক্যাম্প করে গেড়ে থাকা বিশাল পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে সরকার টাটাদের হয়ে ‘জয় করা’ জমিতে দখল নেবার অভিযান ‘অপারেশন এভিকশন’ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সিপিআই(এম) ক্যাডারবাহিনী, জমি দিতে অনিচ্ছুক গ্রামবাসীদের চিনিয়ে দিচ্ছে তারা, তাদের তাড়া করছে, বিভিন্নভাবে হেনস্থা করছে; মাঠে তাদের ফসল নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ নানা নিপীড়ন চালাচ্ছে, বাড়ি বাড়ি ঢুকে লোকদের বের করে আনছে, এই নিপীড়ন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে লাঠিচার্জ করছে। সরকার দাবি করছেন যে বেড়া দেওয়ার কাজ শীঘ্রই শেষ হবে, এক সপ্তাহের মধ্যে টাটাদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হবে। এটাকে তারা তাদের বিজয় হিসেবে দেখাচ্ছেন।

কিন্তু এসব কিছু ঘটার সাথে সাথে কড়া প্রতিবাদ, ব্যাপক প্রতিরোধও ঘটেছে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্যানেল সদস্যদের দুজন ২ ডিসেম্বর, ২০০৬ তা প্রত্যক্ষ করি, যেদিন পুলিশি ব্যারিকেড ও স্থানে স্থানে অবরোধ (তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও নানা স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের করা) সত্ত্বেও কোনও অসুবিধা ছাড়াই একটি গাড়িতে করে তিনজন সাথী-সহ আমরা সিঙ্গুর পৌঁছে যাই। সেদিন সিঙ্গুরে নারী, শিশু

ও বয়স্ক মানুষ-সহ নানা মানুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়— যারা টিয়ারগ্যাস, রবার বুলেট, লাঠিপেটা, পুলিশ কর্তৃক বাড়িতে হামলা, তাদের ধানের গোলা ও জমিয়ে রাখা জ্বালানি কাঠ পুড়িয়ে দেওয়া, বাড়ির ক্ষতি করা, এমনকি শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন। অনেকের কাপড়জামা তখনো ছেঁড়া, শিশু ও বয়স্ক মানুষ-সহ তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে হেঁটে বেড়াবেড়ি থেকে খাসেরভেড়ি এসে তাঁরা দেখালেন, পুলিশের এক বিশাল বাহিনী (অন্তত ১৫০ জন) তখনো মানুষ তাড়ানো অভিযানে রয়ে গেছেন খাসের ভেড়িতে। তাঁদের (মহিলাদের) সঙ্গে ছিলেন পুরুষেরা, যারা তাঁদের স্ত্রী ও মায়েদের ওপর আক্রমণের ঘটনায়, তাঁদের উপর আক্রমণ ও শ্লীলতাহানিতে দারুণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। গাড়িতে আসা পার্টি ক্যাডারদের তাঁরা ‘দু নম্বরি’ বলে উল্লেখ করছিলেন। এইসব কৃষক ও বর্গাদাররা তখনো তাঁদের দুই থেকে চার ফসলি সেচ-সেবিত জমি, যা তাঁদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়, দিতে রাজি নন। তাদের নিজেদের উপর যা হয়েছে তা ভুলে তাঁরা আমাদের অনুরোধ করেন যে আমরা যেন এমন পদক্ষেপ নিই যাতে খাসের ভেড়িতে যে আক্রমণ চলছে তা বন্ধ হয়, আর যে সব নিরীহ কৃষক ও মজুর, নারী, পুরুষ ও কয়েকজন শিশুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে ঠিকমত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঐ দিন, ২ ডিসেম্বর, অন্তত ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়; তাদের মধ্যে আছেন ৭০-৮০ বছরের বৃদ্ধবৃদ্ধারাও— নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ, এ পি ডি আর ও অন্য সংগঠনের ৪ থেকে ৬ জন মহিলা সমাজকর্মী ছাড়া এদের সবাই বিপন্ন পরিবারগুলির সদস্য। চন্দননগরে পুলিশ হেফাজতে থাকা ১৮ জন মহিলা, যাদের সঙ্গে আমরা পরের দিন দেখা করি, তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে মোট ১২টি ধারায়, তার মধ্যে আছে ৩০৭ ও ১৪৩, ১৪৭, ১৫৩ নং ধারা। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হন, তাঁরা ঘটনাক্রম বর্ণনা করেন— তাঁরা যখন ভাত রাঁধছিলেন বা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁদের মারতে মারতে বাড়ি থেকে তুলে আনা হয়। অন্যরা পুলিশের আগমনের প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, জোর গলায় তাদের প্রশ্ন করছিলেন, স্লোগান দিচ্ছিলেন, জোর করে জমি নেওয়া ও তাঁদের জমি দখল করে বেড়া দেওয়ার প্রতিবাদ করছিলেন। ৩ ডিসেম্বর, ২০০৬ চন্দননগর থানার সামনে যে গণবিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, তাতে প্রমাণ হয়ে যায় যে সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীরা বিক্ষুব্ধ, সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষের উপর যে দমনপীড়ন নামিয়ে আনা হয়েছে, আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছে, তাকে খোলাখুলিভাবে ধিক্কার জানাচ্ছেন তাঁরা।

যখন আমরা খাসের ভেড়িতে ঢুকি, আমরা দেখতে পাই দুটি পুলিশের গাড়ি গ্রাম ছেড়ে বড় রাস্তায় যাচ্ছে। অন্তত একজন পদস্থ অফিসারের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের তাদের পেছনে প্রায় দৌড়াতে হয়, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পিছনে অন্তত শখানেক নারীপুরুষ জমে গিয়েছিল। যখন আমরা সিঙ্গুর থানার দারোগা প্রিয়কান্ত বক্সির নাগাল পেলাম, ততক্ষণে পুলিশ আমাদের অনেক পিছনে পড়ে যাওয়া মহিলাদের আটকে দিয়েছে। আরও পরে আমরা দেখি কালো পোষাক পরা র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‍্যাফ)-এর একটি বড়সড় দল বেড়াবেড়ি

গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসছে, লাঠি দিয়ে গ্রামবাসীদের আসা বন্ধ করছে তারা, লাঠিপেটা করছিল কিনা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। গ্রামের পুরুষেরা আমাদের সঙ্গে হাঁটতে থাকেন। কেউ কেউ ক্রোধ প্রকাশ করছিলেন, আবার কেউ কেউ তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। হঠাৎ পিছন থেকে একটা ঢিল এসে পড়ল, একজন পুলিশের গায়ে লাগল। আমরা ব্যাপারটা দেখে ও তা বন্ধ করার জন্য পিছন ফিরলাম, চেঁচিয়ে সবাইকে বলতে লাগলাম এরকম না করতে। আর কোনও ঢিল পড়ে নি, অথচ এর ১০ মিনিটের মধ্যে আমরা দেখলাম যে, কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ দূরের মাঠে খালি-গা, লুঙ্গি পরা একজন কৃষকের দিকে দৌড়ে গেল, তাকে তারা লাঠি দিয়ে পায়ের দিকেভয়ানকভাবে পেটাতে শুরু করল, তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, জোর করে হাঁটাতে থাকল। সমস্ত সংবাদমাধ্যমেই দেখা গেছে এ দৃশ্য, অসহ্য এই দৃশ্য, আমরা তাই ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ালাম, পেটানো বন্ধ করতে পারলেও কৃষকদের গ্রেপ্তার করা আটকাতে পারলাম না আমরা। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুলিশ বেষ্টিত হয়ে পড়লাম। কোন্ ধারায় আমাদের ধরা হচ্ছে তা না বলেই আমাদের ‘গ্রেপ্তার’ করা হল। গাড়িতে আমাদের হাওড়া পর্যন্ত নিয়ে এসে, ৮ গাড়ি পুলিশ বেষ্টিত করে পুরো ৩ ঘন্টা বসিয়ে রেখে তার পর তারা মেধাকে সরকারি অতিথি হিসাবে ঘোষণা করল, আমরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। সারা রাত আমরা জিপেই কাটালাম। আমাদের দাবি ছিল, সাজানো মামলায় অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করে যাদের গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে, তাঁদের মুক্তি দিতে হবে। টিমের অন্য সদস্যদের, (দীপংকর চক্রবর্তী, অমিতদ্যুতি কুমার ও সুমিত চৌধুরিকে) গ্রেপ্তার করে তাদের অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে চুঁচুড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ব্যক্তিগত বণ্ডে মুক্তি দেওয়া হয় তাঁদের। পরের দিন মেধা পাটকর-সহ একটি দল হেফাজতে থাকা আন্দোলনকারীদের সমর্থনে চন্দননগর থানায় পৌঁছান। তাঁরা সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ ও জনসভা করেন। এ পি ডি আর-এর অমিতদ্যুতি কুমার, এন এ পি এম-এর প্রণব ব্যানার্জি সহ অন্যরা, হকারস সংগ্রাম কমিটি-র শক্তিমান ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি-র নারী কর্মীরা, এস ইউ সি আই ও তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা ও অন্যরা ঐ জনসভায় ভাষণ দেন। ৭ ডিসেম্বর, ২০০৬ সব বন্দীদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

* এর অনেক আগে, ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০০৬ পর্যন্ত দাবিয়ে রাখা ও নিপীড়নের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। * ২৯ নভেম্বর, ২০০৬ তারিখে সিপিআই(এম) ক্যাডার বলে চিহ্নিত অনেক বহিরাগত পুলিশের সঙ্গে এসে বেড়া দেওয়ার কাজে সাহায্য করেছেন। জমিতে কাজ করছিলেন যে কৃষকরা, তাঁদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। *ঐ দিন সিঙ্গুরে সিপিআই(এম)-কে এক বিশাল জনসভা করতে দেওয়া হয়েছে। এবং তারপরই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। * সিপিএম ক্যাডার এবং র‍্যাফ বাহিনী সহ পুলিশের এক বিরাট বাহিনী বিপন্ন গ্রামগুলির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, মানুষজনকে ভয় দেখানো, তাদের আতঙ্কগ্রস্থ করা। * ৩০ নভেম্বর, ২০০৬ কৃষি জমি বাঁচাও কমিটি এবং আন্দোলনে

অংশগ্রহণ করা অন্যান্য সংগঠন ও পার্টিগুলিকেই শুধু আটকানো হয়নি, জাঠায় অংশ নেওয়া মানুষদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁকে নিগৃহীত করাও হয়েছে বলে অভিযোগ। কোনও আগাম নোটিশ ছাড়াই এলাকায় ১৪৪ ধারা চাপিয়ে দেওয়া হয়; এটা শুধু অদ্ভুতই নয়, বেআইনিও বটে। এর অর্থ, মন্দ উদ্দেশ্যের অজুহাতে যে কাউকেই সিঙ্গুর যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করা যাবে। বিশেষ করে সিঙ্গুর আন্দোলনের সমর্থক সমাজকর্মীদের, এমন কি বিপন্ন এলাকার স্থানীয় মানুষের জমায়েতও বন্ধ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একটি টেলিফোন-সাক্ষাৎকারে বললেন, ৩০ নভেম্বর, ২০০৬ সিপিআই(এম) ও তৃণমূল কংগ্রেস, উভয়েই জনসভা করতে চেয়েছিল বলে এটা করতে হয়েছিল। কথাটি ভিত্তিহীন। লক্ষ্য করার বিষয় হল, তার আগের দিন, ২৯ নভেম্বরই সিপিআই(এম) ওখানে জনসভা করেছে, আর তাতে সরকার কোনরকম বাধা দেয় নি।

সমাজকর্মী বিলাস সরকার-সহ চার জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বিলাস সরকারের হাত ভেঙেছে। ভর্তি আছে খাসেরভেড়ি গ্রামের শ্রী অশোক পাত্র-র ১২ বছরের মেয়ে ঝুমা পাত্র, সে আহত। পুলিশের এফ আই আর-এ এদের নামও নেই।

এ সমস্ত আরও সব ঘটনা এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, সিঙ্গুরের মানুষকে সমর্থন করতে মানুষদের এগিয়ে আসা দরকার, আর এজন্যই কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি করেছেন, যার পিছনে যুক্তি নেই, আছে মিথ্যাচার। সমাজকর্মীদের তারা সিঙ্গুর যেতে দিচ্ছে না। আটকানো হয়েছে মেধা পাটকরকেও। তিনি এই তদন্ত প্যানেলের একজন সদস্য। মেধাকে আটকানো হয়েছে দু-বার। ৪ ডিসেম্বর ও ৫ ডিসেম্বর। তাঁরা যে ১৪৪ ধারা ভাঙছেন না, ২-৩ জনের দলে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন তাঁরা, এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও অনেকগুলি পুলিশের গাড়ি ভর্তি পুলিশের এক বিশাল বাহিনী তাঁদের ঘেরাও করে রাখে। সন্ত্রাসবাদী মোকাবিলার সঙ্গে তুলনীয় এনকাউন্টারে তাঁদের গ্রেপ্তার করার কারণ হিসাবে পুলিশ অফিসাররা জানান, (ক) আপনি একজন বিখ্যাত লোক, ১৪৪ ধারা জারি থাকা অঞ্চলে আপনার উপস্থিতি ভীড় সৃষ্টি করবে; (খ) আপনার উপস্থিতিই লোককে প্ররোচিত করবে; (গ) এটা আপনার সুরক্ষার জন্যই; (ঘ) অঞ্চলে হিংসাত্মক লোকজনরা আছে, যারা আপনার উপস্থিতির সুযোগ নেবে। তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডানকুনিতে কোল ইণ্ডিয়ার গেস্ট হাউসে রেখে দেওয়া হল, অথচ সেটিকে গ্রেপ্তার বা আটক বলা হল না। এই ব্যাপারটা যে বেআইনি তা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, যাতে করে তিনি যে একজন মুক্ত ব্যক্তি, তাঁর সর্বত্র যাওয়ার অধিকার আছে, সে সম্পর্কে একটা সরাসরি অর্ডার বের করা যায়।

কিন্তু এতে করে আমাদের সিঙ্গুর যাওয়ার সুযোগ বা গ্যারান্টি মেলে নি। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া জানিয়েছে যে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন যে, মেধা পাটকর যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন, যেতে পারেন সিঙ্গুরেও, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার

সময় তিনি তা অস্বীকার করেন।

আজ পর্যন্ত সিঙ্গুর বিচ্ছিন্ন, সারা দুনিয়া থেকে, বিশেষ করে সচেতন মানুষ ও সমাজকর্মীদের থেকে। একদল আইনজীবী যখন সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেন তখন সেটা আবার প্রমাণ হয়। যদিও সংবাদমাধ্যমের যাওয়া একেবারে বন্ধ করা যায় নি।

আরও তথ্য আসছে যে, সংগ্রামের স্থানীয় নেতারা, যারা তৃণমূল কংগ্রেস, এস ইউ সি আই ও নানা গণসংগঠন ও গণ আন্দোলনের স্থানীয় জোট কৃষি জমি রক্ষা কমিটি-র লোক, তাঁরা আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। নারী পুলিশ-সহ অন্তত ১০০০ জন পুলিশ ক্যাম্প করে ওখানে অবস্থান করছে, পাশাপাশি জমিতে বেড়া দেওয়া চলছে, সেখানে ভাড়া করে আনা হচ্ছে বেশিরভাগই বাইরের লোকদের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন যে বেড়া দেওয়ার কাজ ৭০ শতাংশ শেষ, ৮ দিনের মধ্যে টাটাদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হবে।

জনগণের প্রতিরোধ, তাঁদের অবস্থান আগের মতই আছে। স্থানীয় অবস্থা যাঁরা পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন, তাঁরা জানাচ্ছেন যে চেক নেওয়ার জন্য কোনও লাইন পড়ে নি, জমি দেওয়ার জন্যও মানুষ ব্যগ্র হয়ে পড়েন নি। যেরকম নিপীড়ন ও ভয় দেখানো চলছে তাতে মানুষ পথে নামেন নি ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মনোভাব পরিষ্কার। স্থানীয় নারী পুরুষ, জমির মালিকরা প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। যাঁরা অনশন করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, স্থানীয়ভাবে যিনি মাস্টারমশাই নামে খ্যাত। ৪ ডিসেম্বর ২০০৬ খাসের ভেড়ি গ্রামে শুরু হয়েছে এই অনশন। জমি অধিগ্রহণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে ৫টি গ্রামেরই কয়েকশো বাড়িতে কালো পতাকা ওড়ানো হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে সই সংগ্রহ অভিযান, মেমোরাণ্ডাম /এফিডেফিট লেখার প্রক্রিয়া চলছে।

সিঙ্গুরের সমর্থনে সিঙ্গুরের বাইরে সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে ও দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষকদের উপর যে নিপীড়ন নামানো হয়েছে ও তাদের জমি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা উত্তরপ্রদেশের মতোই বলে তাকে ধিক্কার জানিয়েছেন শ্রীভি পি সিং। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সমাজ সচেতনতা ও বিপ্লবী রাজনীতির ইতিহাস আছে এমন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষক করা জনসভা ডেকেছেন এবং সাধারণভাবে আন্দোলনে জড়িত হয়েছেন। টাটার প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, টাটার পণ্য পোড়ানোর যে দু একটা ঘটনা ঘটেছে, তা কয়েকজনের ক্রোধের প্রকাশ— সিঙ্গুরের ঘটনার পর এরকম অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। ১৯টি ও ততোধিক সংগঠন ও তৃণমূল কংগ্রেস, জে ডি (ইউ), সমাজবাদী পার্টি সহ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি নিচ্ছেন, যেমন অবরোধ, 'বন্ধ'। মমতা ব্যানার্জি সহ সংহতি উদ্যোগ, পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি, এন এ পি এম, সিপিআই (এমএল), কানোরিয়া জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, হিন্দুস্থান মোটর্স সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়ন প্রভৃতির ৬ জন প্রতিনিধিদের একটি দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি চলছে। ৭ ডিসেম্বর, ২০০৬ এদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু অন্যরা তাদের জায়গা নেন, জানা গেছে এই মুহূর্তে

অন্তত ২০ জন অনশন করছেন। এপিডিআর এবং বিভিন্ন বিরোধী দল ও গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রায় প্রতিদিনই কলকাতা-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদী কর্মসূচি চলছে।

অনেক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ হচ্ছে। বামপন্থীদের পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সমঝোতার দক্ষিণপন্থী ভূমিকায় ও তাদের হাতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় দিল্লী, মুম্বাই ও অন্যত্র অরুন্ধতী রায়, স্বামী অগ্নিবেশ, সুমিত চক্রবর্তী, আইনজীবী প্রশান্তভূষণ, অরুণা রায়, এস পি শুক্লা অন্যান্য বামপন্থী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠন চিন্তিত— তাদের কাছে সিঙ্গুর একটা চিন্তার বিষয়, পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয় হয়ে উঠেছে। এটা একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন, এ আই এস এ, এন এ পি এম, দিল্লী ফোরাম ও অন্যান্য সংগঠন দিল্লীতে সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় অফিসে একটি ধর্নায় বসেন। সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য নীলোৎপল বসু ও অন্যদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়। কিন্তু তার থেকে তেমন কিছু বেরিয়ে আসে নি। পার্টি ম্যানিফেস্টোর ও ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির বাইরে 'সেকুলার এজেণ্ডা' নিয়ে কোনও সিরিয়াস বিতর্ক উঠবে কি এর থেকে?

❒ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

এটা স্পষ্ট যে, টাটা মোটর প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে আগতপ্রায় কর্পোরেট প্রকল্পগুলির একটি মাত্র। অতীতের শিল্পায়নের বাইরে গিয়ে এ রাজ্য এখন দ্রুত শিল্পায়নের রাস্তায় হাঁটছে, বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আহ্বান করা হচ্ছে। দেশি-বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। আর অন্তত এটুকু তো বলাই যায় যে, জমি অধিগ্রহণ ও কৃষক থেকে মৎস্যজীবী গ্রামবাসীদের উচ্ছেদের কাজটা (তাদের হয়ে) করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে ৫০ হাজারের-এর বেশি কারখানা বন্ধ। মন্ত্রীরা যেমন বলে থাকেন, সেই ট্রেডইউনিয়ন কাজকর্মের জন্য নয়, কারখানাগুলি বন্ধ আছে বিনিয়োগের অভাবে, অর্থ, নতুন প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক এবং বাজারজাতকরণ নীতির অভাবে। সেখানকার শ্রমিকরা সংগ্রাম করছেন। কানোরিয়া জুট মিল ও বাউরিয়া কটন মিলে দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন চলেছে। তার তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হয় নি। বন্ধকারখানার জমি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে, সেখানকার শ্রমিকদের কাজ নেই, তাঁরা দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে আছেন।

বর্গাদারদের জমির মালিকানা দেবার দ্বিতীয় পদক্ষেপটি নেওয়াও খুব প্রয়োজন। তা না করলে অপারেশন বর্গা সম্পূর্ণ হবে না। বিশেষত যখন বর্গা নথিভুক্তকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া চলছে। তার পর সমবায় গড়ে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প কাজে কর্মসংস্থান হতে পারবে ভূমিহীন ও কৃষকদের।

রাজ্যের ৪৮ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছে চাকরির জন্য। আমাদের অভিজ্ঞতা যেখানে আমাদের বিপরীতটাই শিক্ষা দিয়েছে, সেখানে জোরালো কোনও পরিকল্পনা ছাড়া এটা আশা করা যায় না যে, যে সমস্ত চাষি তাঁদের জমি থেকে বা প্রাকৃতিক সম্পদ-ভিত্তিক জীবিকা থেকে উৎখাত হবেন, টাটাদের মোটর

কারখানা অথবা অন্য যে কারখানা হবে তাতে তাঁদের চাকরি হবে, তাঁদের আসল বিনিয়োগকারী হিসাবে তাঁদের পরিচিতি, সম্মান, মর্যাদা দেওয়া হবে। হলদিয়া পৌর কর্পোরেশন এলাকায়, মেদিনীপুর জেলায়, ঝাড়খণ্ড অথবা বিহারে টাটাদের প্রকল্পে যে আদিবাসীরা উৎখাত হয়েছেন, রাজারহাট উপনগরী বা বানতলা প্রকল্পে যে অন্তত ৪০ হাজার উৎখাত হয়েছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা খুব একটা আশার আলোক দেখায় না।

পরিকল্পনাকাররা মনে করেন যে প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু সম্পত্তি নয়, জীবনের অবলম্বন। মুখের উপর শুধু টাকার অংকে ক্ষতিপূরণ ছুঁড়ে দিয়ে এ সম্পদ কেড়ে নেওয়া যায় না। বেশির ভাগ কৃষক আজ আর এইরকম ক্ষতিপূরণ মানেন না। সিঙ্গুরের বাসিন্দা-জমিমালিক-কৃষকরাও আজ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের ৪ নং ধারার নোটিশ হাতে না নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা বাস্তুচ্যুতি একেবারে না করা অথবা নেহাত অবশ্যপ্রয়োজনীয় নিম্নতম সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুতির নীতিতে বিশ্বাসী। তাই সরকার যে দাবি করছেন যে প্রায় সব কৃষক টাকার বদলে (একর পিছু ১২ লক্ষ টাকা) জমি দিতে রাজি হয়েছেন, ৯৯৭ একরের মধ্যে ৯৫৭ একর জমিই পাওয়া গিয়েছে, সে দাবি মিথ্যা। বেসরকারি সূত্রে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে একর প্রতি ৬ থেকে ৮ লক্ষ টাকা, যা খোলা বাজারে জমির যা দর, ১২ থেকে ২৪ লক্ষ টাকা, তার অর্ধেক। জমি বিক্রির দলিলে জমির যে দাম লেখা থাকে তা কখনোই নির্ভরযোগ্য হয় না, সেখানে জমির দাম অনেক কম দেখানো থাকে।

কিন্তু কথাটা শুধু টাকার নয়— জীবন-জীবিকার, বাঁচার অধিকারের, এমন কি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বজায় রাখারও। শহরাঞ্চলের আশপাশের বস্তি এলাকায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে কৃষকরা যদি কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে পছন্দ করেন, তাঁদের বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে তাঁদের উৎখাত করা উচিত নয়, সেটা করা যায় না। এমন কি যদি বাস্তুবাড়ি অধিগ্রহণ করা না-ও হয়, জমি হারালে তাঁদের তো বাড়িঘর ছেড়ে, চেনা পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

পুনর্বাসন নিয়ে কথা বলতে রাজি আছেন সরকার। কিন্তু একে দেখা হয় একটা অসম্ভব কাজ হিসাবে, একটা অন্যায় দাবি হিসাবে। জাতীয় পুনর্বাসন নীতি, ২০০৩ তার প্রথম লক্ষ্য রেখেছে, উৎখাত কমানো। সিঙ্গুরের টাটা প্রকল্পে এর কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।

টাটা প্রকল্প নিয়ে বিতর্ক এখন সামনে এসে গেছে। টাটা মোটরের কতটা জমি লাগতে পারে তা নিয়ে পরিষ্কার প্রশ্ন উঠেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এমন কোনও কোনও মোটর কারখানা হয়তো থাকতে পারে, যেগুলিতে জমি এর সমান। আবার আছে পুনেতে টাটারই কারখানা, যেখানে মোটরগাড়ি ও ট্রাক উৎপাদন হয়, আর তার জমির পরিমাণ মাত্র ৫১০ একর (রবিন্দর কুমার, দি স্টেটসম্যান, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর, ২০০৬)। এটা পরিষ্কার যে, শিল্পসংস্থাগুলি যতটা জমি মূল শিল্প উদ্যোগের জন্য দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি জমি অধিগ্রহণ করতে চায় সাধারণ এলাকাতে ও এস ই জেড-এ। তারা সেখানে নানা পরিকাঠামো

গড়ে, গড়ে অফিসারদের কোয়ার্টার্স, জলের ও বিদ্যুতের নিজস্ব ব্যবস্থা। কর্পোরেট জগতে কাজ করা ব্যক্তিদের জন্য আরাম ও বিলাসিতার ব্যবস্থা করা হয় সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতির উপর অমানুষিক চাপ দিয়ে। এমনকি ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণের ব্রিটিশ আইনেও বলা হয়েছে যে, জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যেতে পারে যেসব কারণে তার একটা হল, যত জমি দরকার তার চেয়ে বেশি জমি যদি অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু কে মানে এ সব? ৫ (ক) ধারায় বিপন্ন মানুষদের বক্তব্য শোনা হয় না। প্রশ্ন যেটুকু তোলা হয়, তা তোলা হয় আইনি কাঠামোয় নয়, জনতার আদালতে, যেমনটা ঘটেছে সিঙ্গুরে।

বিকল্প প্রস্তাবগুলি নিয়ে টাটারা তাদের মত জানায় নি, তার প্রয়োজনও হচ্ছে না, কারণ রাজ্য সরকারই তাদের হয়ে লড়ছে। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে আলোচনায় স্পষ্ট যে টাটারা খড়গপুরের একটা জমি পছন্দ করে নি, তাদের পছন্দ সিঙ্গুর। কারণ সিঙ্গুর কলকাতার কাছে, সেখানে একটা তৈরি পরিকাঠামো আছে, আছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের মত রাস্তা। এটা কি মেনে নেওয়া যায়? এস ই জেড-এর মত এখানেও জমি পছন্দ করা, তার পরিমাণ, এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা সহ সমস্ত কিছু টাটাদের সঙ্গে দরকষাকষির মধ্য দিয়ে স্থির করতে হবে, কিন্তু সরকার তা করছে না। এটা একটা ভয়ানক অবস্থা, এখানে সবাই সমান নয়— টাকা বিনিয়োগ করবে যে তাকে খাতির করা হবে, আর প্রাকৃতিক সম্পদ বিনিয়োগ করবে যারা তাদের করা হবে না। 'লাঙ্গল যার, জমি তার'— ভূমিসংস্কারের এই মৌলিক নীতির স্থান নিয়েছে 'পুঁজি যার, জমি তার' নীতি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিধানসভায় স্বীকার করেছেন যে, পুঁজি দেবে, তিনি তারই 'এজেন্ট' হিসেবে কাজ করবেন। বাজারের শক্তিগুলি এটা করে তা জানা কথা, কিন্তু কল্যাণমূলক রাষ্ট্রও যদি তা-ই করে, তাহলে ভারতবাসীর নামে শপথ করে লিখিত সংবিধানের আর কী বাকি থাকে?

সিঙ্গুর প্রকল্পের কিছু কিছু তথ্য যেমন করে একটা গোপনীয়তার আড়াল থেকে একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছে, সে ব্যাপারটাও দুশ্চিন্তা করার মত। বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে যখন এটা আসে তখন তাদের নির্বাচন ম্যানিফেস্টোতে যে স্বচ্ছতার কথা, দায়িত্বশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তাকেই যেন এগুলি ব্যঙ্গ করে। প্যানেল সদস্য হিসাবে তথ্য ও দলিলাদি চেয়ে শিল্পমন্ত্রককে লেখা আমাদের চিঠির জবাব না দেওয়া থেকেও এটাই প্রমাণ হয়— যদিও আমাদের বলা হয়েছিল যে, আমাদের ঐগুলি দেওয়া হবে। অভিজ্ঞ মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এরও এ নিয়ে অভিজ্ঞতা ভাল নয়। শিল্পমন্ত্রী আমাদের, সংবাদমাধ্যমগুলিকে ও খোলাখুলি মানুষকে যা বলেছেন, এবং সাধারণ মানুষ আমাদের যা জানিয়েছেন, তার বাইরে ঐ প্রকল্প সম্পর্কে আর কিছুই জানা নেই, অথচ ঐ প্রকল্প নাকি হচ্ছে 'জনস্বার্থে'। এর থেকে যে বিষয়গুলি বেরিয়ে আসে তা এই রকম—

১.বিকাশের পরিকল্পনা যদি গণতান্ত্রিকভাবে করতে হয়, মানুষের জন্য করতে হয়,

তবে তা জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া করা যায় না, করার কোনও মানেও হয় না। এর শু(হতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর স্থানীয় মানুষের অধিকার দিয়ে, প্রযুক্তি(পছন্দ করার অধিকারও দিতে হবে তাদের। বিকাশ প্রকল্পে অগ্রাধিকার পাবেন তারা, যে দাম দিতে হবে আর যে সুবিধা পাওয়া যাবে, তার তুল্যমূল্য বিচার করতে হবে।

২.বিরাট সংখ্যক কৃষক,বর্গাদার ও খেতমজুর যখন প্রকল্পে জমি দেন নি, যা তথ্য থেকে ও তাঁদের এফিডেফিট থেকে প্রমাণিত, তখন গায়ের জোরে, পুলিশ ও পার্টি ক্যাডার ব্যবহার করে প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অমানবিক ও অসাংবিধানিক।

৩.মাঠে জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে যে লড়াই চলেছে, তাতে প্রমাণিত যে, উৎখাত হওয়া মানুষরা এ কাজে সম্মতি দেন নি। অর্থাৎ, সরকারি বক্ত(ব্য অসত্য।

৪. সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী অনুসারে গ্রামসভার যে মিটিং ডাকার কথা তা ডাকা হয় নি, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

৫.টাটার মোটর প্রকল্পের জন্য (তিগ্রস্ত মানুষদের বিকল্প সংস্থানের প্রয়োজনীয়তাকে 'জনস্বার্থ' বলে স্বীকারই করা হচ্ছে না।

৬. যে জমি নেওয়া হয়েছে, তা খাল ও কানা নদীর জলে সেচ-সেবিত সর্বসুবিধাযুক্ত(উচ্চফলনশীল কৃষি জমি। এ জমি নষ্ট করতে দেওয়া উচিত নয় সরকারের বা সাধারণ মানুষের। দামোদর ভ্যালি প্রকল্পের সুবিধাগুলি এভাবে নষ্ট করা উচিত নয়। জল সম্পদকে র(া করা দরকার।

৭.কৃষি ও সাধারণ মানুষকে বলি দিয়ে কোম্পানিগুলিকে মুনাফা করতে দেওয়া যায় না।

৮. জাতীয় পুনর্বাসন প্রকল্প, ২০০৩ অনুসারে সামাজিক ও পরিবেশগত (তি যাতে ন্যূনতম হয়, তার জন্য সিঙ্গুরই শ্রেষ্ঠ উপায়, এমন কথা প্রমাণিত হয়নি।

৯. ভয় দেখানোর জন্য পুলিশি নিপীড়ন চলছে, আন্দোলনও চলছে। এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে। একে বাড়তে দেওয়া চলবে না। একজন মন্ত্রী যেমন বলেছেন, সেইমত পার্টি ক্যাডাররা এসে ব্যাপারটাকে আরও যেন বাড়িয়ে না তোলে।

১০. রাষ্ট্রের তরফে হিংসার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। জনগণের উচিত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। দেশের অংশ হিসেবে সিঙ্গুরের সব সমর্থকদের ও

দর্শনার্থীদের সিঙ্গুর যেতে দেওয়া উচিত।

১১. অনশনকারী ও গণআন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। পুলিশ সরিয়ে নিয়ে ও মিথ্যা মামলা তুলে নিয়ে আলোচনার বাতাবরণ তৈরি করা উচিত।

১২. শুধু মানবাধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে নয়, কথা হওয়া দরকার প্রাকৃতিক সম্পদে জনগণের অধিকার নিয়ে, তার ব্যবহার সংত্র(ান্ত পরিকল্পনায় তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে। এর শু(হওয়া উচিত সিঙ্গুর প্রকল্প দিয়ে, উৎখাত হওয়া নিয়ে, তার বিভিন্ন অর্থনৈতিক দিক নিয়েও।

❒ এই প্রে(িতে আমাদের বক্ত(ব্য

ক) আমরা বামফ্রন্ট সরকারের কাছে জনমুখী অবস্থান নিতে, চাষের জমি ও কৃষকদের এবং গণতন্ত্রকেও, র(া করার জন্য আবেদন করছি।

খ) শিল্পায়নকে হতে হবে কৃষির সম্পূরক, পরিপূরক। কৃষি অর্থনীতি, যা আমাদের খাদ্য সুর(া দেয় ও ৬০ শতাংশ মানুষের (টি(জির ব্যবস্থা করে, তার উপর শিল্প যেন চাপ সৃষ্টি না করে।

গ) সংবিধান ও তা র(ার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বি(মানবাধিকার দিবসের প্রাক্কালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই ঘটনায় তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

ঘ) টাটাদের আর কোনও জমি খুঁজে নিতে হবে। যে বিশাল মুনাফা হয় তাদের, তার একটা অংশ মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।

ঙ) সমস্ত প্রকল্পে ও এস ই জেড-এ কৃষি জমি হস্তান্তর নিয়ে সব রাজ্যে একই অবস্থান নিতে হবে বামফ্রন্ট সরকারের সব শরিক দলগলিকে।

চ) এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের উচিত সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে যে বিষয়গুলি আলোচনায় আসছে, সেগুলি নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বিতর্ক তোলা এবং এর মধ্য দিয়ে একটা বিকাশের একটা জাতীয় নীতি গঠনের ব্যবস্থা করা।❒

কলকাতা **শ্রীমতি মহাশ্বেতা দেবী** **শ্রীমতি মেধা পাটকর**

ডিসেম্বর ৮,২০০৬ **শ্রী দীপংকর চত্র(বর্তী** **জাস্টিস (অবসরপ্রাপ্ত) মলয় সেনগুপ্ত**

জমি অধিগ্রহণ আইন-১৮৯৪ এর ধারা ৪(১) অনুযায়ী একই বয়ানে মোট তেরটি নোটিশ জারি করা হয় ২০০৬-এর ১৯ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই এর মধ্যে। কৃষকরা এই নোটিশ গ্রামে জারি করতে দেননি। ধারা ৬ অনুসারে একই ভাবে ২৯ আগষ্ট থেকে ৩১ আগষ্টের মধ্যে খাতায়-কলমে নোটিশ জারি করা হয়। দাম ঘোষণার তারিখ দেখানো হয়েছে ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর।

Government of West Bengal

Office of the Land Acquisition Collector & District Magistrate & Collector, Hooghly

Notification for Acquisition of Land u/s 4, Land Acquisition Act,1894

Hooghly No. 273-LA/IV-6/2006-07 Dated: 20/07/2006.

Whereas, it appears to the Governor that land as mentioned in schedule below is likely to be needed to be taken by Government /Government Undertaking/Development Authorities, at the public expense for a public purpose, viz., employment generation and socio economic development of the area by setting up TATA Small Car Project in the Mouza(s) Beraberi, Jurisdiction List No. 5, P.S. Singur, District Hooghly; it is hereby notified that for the above purpose an area of land comprising RS/LR plots as detailed below and measuring, more or less, 72.03 acres, as specified below within the aforesaid Mouza(s).

This notification is made under the provisions of section 4 of Act I of 1894, inviting all owners of land and persons having interest in the said land to submit their written objection if any, to the acquisition of the land or of any land in the locality, as the case may be, within 30 days from the date of publication of this notification.

It is hereby further notified that for the general benefit of the public, open perusal and for ready reference, the plan drawn on original mouza map of the land to be acquired, and plot-wise ownership details, area of the plot, share of the owner in the plot and current land use of the plot including barga-rights recorded in the plot latest as available with LR Administration) have been displayed mouza-wise in the office of the Land Acquisition Collector of the District of Hooghly and other offices namely as offices of DLLRO, BDO & BLLRO, RI, Gram Panchayet and the same shall remain available for inspection by the land owner and any person having interest in the concerned land during the office hours of all working days for a period of not less than 30 days from the date of publication of this notification.

All land owners and interested parties are requested to approach the Office of the concerned BL&LRO for correction, updation, mutation and payment of all arrear dues of land revenue and thereafter submit petition to the Land Acquisition Collector to incorporate such changes on production of "mutation certificates" or corrected version of "latest authenticated copy of

RORs" and land revenue payment receipts to protect their rights to claim lawfully admissible LA compensation & due RR benefit.

All land owners and persons interested in the concerned land may apply to avail the benefit of consent awards, submitting their applications Form No. 666-LA-02 to be used by a land-owner, Form No. 666-LA-03 to be used by a Bargadar and Form No. 666-LA-04 to be used by the DL&LRO. Claims of the consent award shall include fair and reasonable compensation for land, anything attached to land and for damages sustained or loss of earnings as per provisions u/s 23 of the LA Act of 1894, enclosing such supporting documents as have been prescribed in the aforesaid forms, seeking most early disposal of their LA compensation and resettlement and rehabilitation claims in terms of their consent award under the provisions of subsection (2) of section 11 of the aforesaid Act. The aforesaid prescribed forms may be collected free of cost from the Office of the Land Acquisition Collector(s) at the district headquarters and its subordinate office units and camp offices, if opened in this connection and such applications may be submitted to such offices of the LA Collectors as will be prescribed by the Collector in his notice board w.e.f. the date of publication of this notification and before expiry of 30 days from the date of publication of the declaration u/s 6 of the aforesaid Act. All land owners and interested parties as well as any nationalized or foreign bank's representative, Central Government, State Government, Government Undertaking, Department or representative of any other private sectors, are to disclose about the liabilities/mortgaged liabilities before the Land Acquisition Collector w.e.f. the date of publication of this notification and positively before expiry of 30 days after the publication of the declaration u/s 6 of the aforesaid Act.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor is hereby pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen, to enter upon and survey the land and do all acts required or permitted by that section.

For greater transparency and convenience of the citizens, a copy of this notice as well as the detailed land schedule, plot-wise ownership date, area, share and land use have been also hosted in Bengali language in the website viz. http://www.hooghly.nic.in, which will also be used to host declaration u/s 6, public notices, date of hearing u/s 9 and award made for payment. Any citizen shall have full right to download and take print of all the materials hosted in the website.

Place : Chinsurah *By the order of the Governor,*

Date : *Sd/ (BINOD KUMAR)*

The Collector under Act-I of 1894, & District Magistrate, Hooghly & Ex-officio, Joint Secretary,L & LR Dept.

এ পি ডি আর সিঙ্গুর নিয়ে তার তথ্যানুসন্ধানের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে এবং টাটা মোটর কর্তৃপক্ষের কাছেও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিল। টাটা মোটরের পক্ষে তাদের জনসংযো অফিসার প্রথমে ইতিবাচক সাড়া দেন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আলোচনার ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন। পরে পিছিয়ে যান এবং এ নিয়ে পরবর্তী চিঠিপত্রের কোনো উত্তরও দেন না।

APDR HOOGHLY DIST. COMMTTEE LETTER TO TATA MOTORS

NO.135/2006 DATED 26.7.2006

Debasis Ray
Head (Corporate Communications)
Tata Motors Limited

Dear Shri Ray,

APDR is studying the implications of the proposed Small Car project of the Tata Motors in Singur, Hooghly on peoples' legal and human rights. For this we need to know some aspects of the project, but unfortunately little details have so far been made available through press.

I would request you to make available to us all details regarding the proposed project which you think may help our study .We have several unanswered queries on the already available information.

Will it be possible to arrange a meeting with an APDR team for interaction with an appropriate official of your company ?

Hoping to have your quick response.

Thanking you

Yours faithfully,
Amitadyuti Kumar
President, District APDR

TATA MOTORS REPLY DATED 27.7.06 TO APDR

(By E-mail)

Dear Mr. Kumar,

Thank you for your mail.

Please allow me to discuss your proposal with our senior management, and come back to you.

Meanwhile, I am enclosing for your reference a Press Release we had issued on May 18, 2006, announcing the plant at Singur.

Kind regards

Debasis Ray

Head - Corporate Communications

Tata Motors Limited

===

PRESS RELEASE ISSUED BY TATA MOTORS ON MAY 18, 2006

TATA MOTORS' FIRST PLANT FOR SMALL CAR TO COME UP IN WEST BENGAL

"Kolkata, May 18, 2006: Tata Motors today took a major step in its small car project, by announcing the setting up of its first plant in West Bengal. The plant will come up at Singur block of Chandannagar sub-division in the Hooghly district.

"Speaking at the announcement, the Chairman of Tata Motors, Mr. Ratan N. Tata, said, "This investment is a reflection of the confidence that the Tata Group has in the investment climate and the Government of West Bengal. We look forward to the opportunity of revitalising the automotive industry in the state."

"The plant will be spread over an area of 700 acres, with additional facilities for a vendor park. The total investment is likely to be over Rs.1,000 crores, including direct investment by Tata Motors and that by its vendors.

"The plant will initially directly employ 2,000 persons, and is expected to create employment in excess of 10,000 jobs amongst the vendors and service providers in the vicinity of the plant. The construction work will commence shortly, and the plant will be commissioned in 2008."

জমি অধিগ্রহণ আইন-১৮৯৪ এর ধারা ৪ অনুযায়ী সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের জন্য যে তেরটি নোটিশ জারি করা হয়, তার প্রত্যুত্তরে *APDR* নীচের চিঠিটির মাধ্যমে অধিগ্রহণ বিষয়ে আপত্তি জানায় এবং শুনানির দাবি জানায়। প্রশাসন আইনানুসারে এই আপত্তির বিষয়ে শুনানি করেনি—বিষয়টি নিয়ে *APDR*-এর মামলা বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের বিবেচনাধীন।

ASSOCIATION FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS (APDR)

HOOGHLY DISTRICT COMMITTEE

Senpara, P.O.Burashibtala, Chinsurah, Dist. Hooghly, W.B., PIN 712105

No.156/2006 *Dated 17.8.2006*

To,
The Land Acquisition Officer/Authority,
Dist- Hooghly, West Bengal.

Sir,

Ref: Notice being Hooghly No. 280-LA/IV-15/2006-07 dated 24.07.2006 and other notices issued u/s 4 of Land Acquisition Act in respect to lands for setting up 'Tata Motor Small Car Project' at Singur, within Dist- Hooghly.

Sub: Objection and claim under provision of Land Acquisitions- Act, 1894 and provision of impugned notices published on acquisition of agricultural lands for setting up of 'Tata Motor Small Car Project'.

Ours is an association of people of West Bengal, champions cause of peaceful and safe living of people with dignity and also works for protection of Human Rights, Democratic and Civil Rights and also for protection of constitutional rights and other legal rights of the people of the state of West Bengal. Members of our association are the citizen of India and reside in different parts of West Bengal including district Hooghly.

2. It has been stated by the authority concerned of the West Bengal Government that lands measuring more than 1,000 acre are required for the purpose of 'public interest vis-a-vis socioeconomic development and creation of opportunities of employment by setting up Tata Small Car Project and it has been learnt that impugned notifications has been published in respect to part of lands on different dates out total lands in question. Impugned acquisition of such huge agricultural lands in a stretch for the purpose other than agriculture, stated in the impugned notification, will

have a wide consequential effect and will prejudice interest of people at large, consequential effect on rights and privileges of people in the locality, in different ways, are also matters of fact. As such, we place this present objection to the impugned notifications as well as impugned acquisition, referred above, under provision of Land Acquisition Act, 1894. Objections raised in the matter are on the following grounds amongst others.

(i) Lands in question produce different corps thrice or four times a year and character of such lands, as recorded, are agricultural lands. The lands are earmarked as Prime Agricultural Land in the locality. Nonetheless, at least three Deep Tube wells and thirty Mini-Deep Tube wells are in operation in the area to cater irrigation facilities to the lands, in question, for which peasants are used to pay water tax at prescribed rate to the respective department of the government.

(ii) West Bengal government's declared policy is 'to avoid selection of multiple cropped/irrigated areas, forests, area adjacent to the river Hooghly, and area declared as wet land, land owned and possessed by the tribal raiyats, pattaholders and bragadras'. Please refer policy and guidelines declared by the State Government contained in a book titled "Procedure For Owning Industrial Land In West Bengal", published by the West Bengal Industrial Development Corporation in 2001 under the head "Information on Simplified Procedure : Purchase And Acquisition Of Land for Industrial Use". We state that selection of lands in question, is in contravention to the said declared 'policy and guidelines' of the government. We also state that already there is inadequacy of agricultural land in the state caused by dispossession of lands for purposes other than agriculture. (Facts, statistical data and information published by concerned departments of the governments depicts alarming position in this respect. We prefer to present such relevant data, information, analysis in course of discussion with you and request you for arrangement of such a discussion in your office at your earliest convenience.)

(iii) Impugned Acquisition of lands in question will further cause inadequacy of lands available for agriculture production due to continuous possession of agricultural lands for other purposes and this will cause a state of disarray in the realm of food production. In this respect, we refer statements made by the Minister-in-Charge, Department of Land and Land Revenue and the former Minister of Agriculture of the state in the matter of alarming dispossession of agricultural lands. Such statements were published in the daily newspapers and such statements are very much within the public knowledge.

(iv) It is disputed that setting up of ‘Tata Small Car Project’ will create more opportunities of employment than opportunities of employment and opportunities to earn subsists at present since use of such agricultural lands cater the needs of local people and people .from far away in various ways.

(v) We also write to dispute that the quantity of land declared to be acquired is rational and state that it is far more than the quantity that may be reasonably required. We also write to state that non-agricultural lands suitable for establishment of industries are available elsewhere in the District itself.

(vi) We also state that besides rights to lands of the owners, Pattaholders, Bargadars, tribal raiyata, people of the locality have also other interest in the lands and area. Impugned acquisition of lands will infringe upon right to life, right to profession, right to food, right to livelihood and other rights enshrined in Art. 19(g), Art.21 read with Art. 39 and other legal rights of the people.

(vi) Without prejudice to our claim and contention stated hereinabove, we also write to register our concern in the matter of adequate compensation under provisions of law and also compensation recognized by the Governments in case of impugned acquisition of lands.

3. We request you to take into consideration our objections and claims, stated hereinabove, and pass reasoned and lawful order in the matter.Thanking you,

Yours faithfully,

Date: 17th August, 2006.

(*Amitadyuti Kumar*),President,
APDR Hooghly District Committee.

অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যালের নীচের বিবৃতিটি ২০০৭-এর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে নন্দীগ্রামের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত হলেও প্রসঙ্গটিতে সিঙ্গুরও উল্লিখিত। তাই ঐ বিবৃতিটি এখানে মুদ্রিত হল।

AMNESTY INTERNATIONAL Public Statement AI Index: ASA 20/004/2007 11 January 2007

India: Deaths in West Bengal during protest against new industrial project

AI Index: ASA 20/004/2007 (Public)News Service No: 006 11 January 2007

As protests by farming communities fearing displacement from their land as a result of a new industrial project continue to lead to violence in West Bengal (Eastern India), Amnesty International is concerned at reports that state officials may be responsible for, or complicit in, human rights abuses including torture and the death or injury of protestors following the use of excessive and unnecessary force.

At least seven people were reported killed and at least 20 others injured since 7 January in continuing violence in Nandigram, Eastern Midnapore district, West Bengal where farmers are protesting an initiative by the Bengal state government to acquire land for a new industrial project. Among those killed was a 14-year-old boy.

Violent clashes in Nandigram reportedly involved members of the local Krishjami Raksha Committee (Save Farmland Committee) and persons linked to the Communist Party of India-Marxist (CPI-M), which leads West Bengal’s Left Front government and is seeking to accelerate the development of industrial projects in the state.

Human rights organisations allege that the farmers were attacked by armed men affiliated to the CPI-M acting in complicity with the police. The reports say the attackers fired at the farmers and branded some of them with hot iron rods as “punishment” for protesting against the industrial project. There have been reports of farmers carrying out attacks on local CPI-M offices in the area, forcing them to flee elsewhere.

In this context, Amnesty International urges the Government of West Bengal to:

- order an impartial and independent inquiry into the Nandigram violence, promptly make the findings public and prosecute those accused of violence;

- ensure that all state officials, including police personnel, who are suspected of being responsible for human rights violations, including ex-

cessive use of force, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment are prosecuted;

- release those detained without any specific criminal charges at Nandigram and ensure that activists and other individuals engaged in peaceful protests should be able to do so without fear of violence, harassment or false accusation of involvement in criminal activities.

Amnesty International believes that full consultations about the human rights impact of economic decisions with those to be affected are vital means through which human rights are safeguarded in the context of development. In this respect, the organisation calls on the Government of West Bengal to:

- announce and implement a consistent policy of full consultation with local populations before any development which could affect their livelihood can take place and
- ensure that, where populations are resettled, there is just, adequate and culturally-sensitive rehabilitation, resettlement and reparation for those affected.

Background Since 3 January 2007, Nandigram has witnessed protests by local farmers after they came to know about a notification issued by authorities at the neighbouring Haldia port identifying their lands as sites to be acquired for the new chemical production project. This notification has since been withdrawn by the West Bengal government which has stated it would “exercise caution” while going ahead with the project.

The project reportedly requires at least 4,000 hectares of land for setting up a Special Economic Zone (SEZ) which would be jointly developed as a chemical hub by the state-owned Industrial Development Corporation and the Indonesia-based Salem group of companies. Another SEZ promoted by the same group is also reportedly planned in the Haldia area.

The protests at Nandigram followed unrest in Singur (West Bengal) in December 2006, when opposition parties and a number of farmers threatened with displacement by a state government move to acquire farm land for a Tata Motors’ automobile manufacturing project prompted demonstrations. The West Bengal state government plans to set up at least six other major industrial projects, including SEZs, in the state, necessitating the acquiring of at least 10,000 hectares of land.

In a bid to boost national economic growth, India has been promoting SEZs across the country. The policy of acquiring land for such industrial projects has sparked protests from local communities fearing land displacement and threats to their sustainable livelihood.

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ অনুসারে সিঙ্গুরে টাটার প্রকল্পের বিভিন্ন দিক জানতে চেয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে যে সব আবেদন করা হয়েছিল, তার একটির উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম (*WBIDC*) নীচের চিঠিটি পাঠিয়েছে। এতেই মোটা অক্ষরে আমাদের জানতে চাওয়া বিষয়গুলো উল্লেখ করা আছে। ***I(e), II*** এবং ***III*** নং পয়েন্টে জমির দাম টাটারা দিচ্ছে কিনা, সমঝোতা পত্রের বিষয় ও টাটাদের কি কি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ এর ধারা *8(d)* উল্লেখ করে এগুলো জানানো হয়নি। যার অর্থ, বলা হয়েছে, এসব তথ্য প্রকাশ পেলে টাটাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

WEST BENGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD

(A GOVERNMENT OF WEST BENGAL UNDERTAKING)

5, COUNCIL HOUSE STREET, KOLKATA - 700 001

No Adm/141/2006/3113 *Dtd December 04 ,2006*

From: Sri D.P.Goswami, DGM(P&A) & State Public Information Officer.
WBIDC Ltd

To: Sri Amitadyuti Kumar, President,
ASSOCIATION FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS
Hoogly District Committee
Senpara. P.O Burashibtala, Chinsurah Dist Hoogly. PIN - 712105

Ref: Your application dtd 2. 11 .2006
Sub: Information relating to proposed Tata small car project at Singur in the District of Hoogly

Sir,

With reference to the above the following information are given:

L(a) Quantity of land requisitioned/proposed to be requisitioned for Tata Motors small car project at Singur, Hooghly and the nature and/or character of the land preferred and rationality of such preference.

I (a). Quantity of land is 997.1 1 acres.

Nature/Character of land - enclosed at Annexure A.

Rationality of preference: The preference has been based on accessibility and availability of infrastructure.

I(b) Proposed activities of the Company on the land requisitioned/ proposed to be requisitioned with details break up as far as possible.

I(b). Proposed activities:

i) Mother plant for small car with planned capacity of 5 lakhs per year on 700 acres.

ii) First Tier vendors' factories on 300 acres.

I© Materials on the basis of which the "land requirement has been rationally assessed" in terms of para 3 © of Govt. of West Bengal, Land and Land Reforms Department Memo No. 701-3M-07/06, dated 6 March 2006.

I©. Comparative area of other similar projects with similar capacity of production along with requirement of first tier vendors.

I(d) The cost of the land in 1 (a) above assessed by the acquisitioning authority under Land Acquisition Act 1894.

I(d) Rs. 131.49Crores

I(f) Amount deposited by the WBIDC to and

I(f) Rs.l38crores.

I(e) Amount if any deposited by the Tata Motors to the WBIDC.

II. Details of incentives under the West Bengal Incentive Scheme 2004 (No. 134 CI/O/Incentive/17/03/1 dated 24 March, 2004) or under any other scheme/proposal

(a) claimed by the Tata Motors for the project

(b) offered/agreed to be offered by the WBIDC to the Tata Motors for the project

(c) proposals/claims for incentives under consideration of the WBIDC or any other Government agency

III. Whether any Memorandum of Understanding was reached with the above company on the project and

(i) if yes, a copy of the MOU

(ii) if no, a copy of the salient points of the draft of such MOU being discussed.

I(e), ***II & III.*** *Disclosure of information sought cannot be allowed under section 8(d) of the RTI Act*

In connection with the above it is further informed that Sri Naveen Prakash,IAS,Executive Director(Promotion),WBIDC Ltd is the designated Appellate Authority.

Appeal may be preferred to the above Authority within thirty days of receipt of this letter as per provision of Sub-Section (1) of Section 19 of the Right to Information Act, 2005.

Enclo: Annexure - A

Yours faithfully,

Sd/ (D.P.Goswami)

Dy.General Manager(P&A) & Stata Public Information Officer,WBIDC Ltd

Post Box 649 : Phone : EPABX No. 2210-5361 - 65 : Fax : 033-2248-3737 Website : *www.wbidc.com* *E-mail : wbidc@vsnl.com*

Annexure - A

Schedule of land

Mouza	Bera-beri	Khasher bheri	Singer bheri	Baje melia	Gopal nagar	Total
Path/ Rasta	1.71	0.00	0.00	0.02	0.00	**1.73**
Sali	292.74	161.05	29.36	46.91	370.14	**900.20**
Suna	19.37	8.13	2.58	0.00	6.49	**36.57**
Danga	0.93	0.00	0.12	0.00	0.70	**1.75**
Khal/ Nala	0.49	0.04	2.49	0.08	0.00	**3.10**
Mandir/Debottar	0.20	0.00	0.00	0.03	0.00	**0.23**
Viti/	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.87**
Bastu	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	**0.26**
Shashan	1. 13	0.09	0.00	0.00	0.00	**1.22**
Bashbagan	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	**0.35**
N.Juli	4.97	3.76	2.38	0.00	5.40	**16.51**
Doba/ Pukur	1.73	0.39	0.05	0.00	4.49	**6.66**
Bandh	3.07	6.76	4.49	0~67	12.45	**27.44**
Bagan	0.00	0.00	0.00	0.06	0.16	**0.22**
TOTAL	**327.21**	**180.68**	**41.47**	**47.77**	**399.98**	**997.11**

(All land measures in Schedule of Land above are in acres)

আমাদের মন্তব্য জমির উপরের বিবরণ সম্পূর্ণতই বিভ্রান্তিকর । সরকারি দপ্তরের হিসেবে নাকি এক ফসলীই হোক আর পাঁচ ফসলীই হোক— সবই 'শালি'। সিঙ্গুরে গত কয়েকমাসের মধ্যে যাঁরাই গেছেন, তাঁদের সকলেই ঐ জমিগুলিকে বহুফসলী উর্বরা বলেই অবিসম্বাদী মত দিয়েছেন। সেচের ব্যবস্থা, সারের ব্যবহার তথা কৃষকদের বক্ত(ব্যও তাই। সরকারি কর্তারা সামনা-সামনি আলোচনাতেও তা স্বীকার করেন। বাস্তবে 'শালি' বলে চিহ্নি(ত উপরের ৯০০.২০ একরের প্রায় সবটাই বহুফসলী। ❒

কৃষিতে সিঙ্গুর ব্লক

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, সিঙ্গুর, হুগলী কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রকাশিত '**কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সহায়িকা**'-র ২ ও ৩ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি)

অবস্থান ঃ পূর্বে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া, পশ্চিমে হরিপাল ব্লক, উত্তরে পোলবা-দাদপুর এবং দক্ষিণে চণ্ডীতলা ১ এবং ২

সিঙ্গুর থানা এলাকার সম্পূর্ণ অংশ এবং ভদ্রেশ্বর থানা এলাকার কিছুটা অংশ অন্তর্ভুক্ত।

মৌজার সংখ্যা	১০৯	ভৌগোলিক এলাকা	১৯,১৯৫ হেক্টর
কৃষিজমির পরিমাণ	১০,৫২৬ হেক্টর		
সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ	৮,৮৩০ হেক্টর (৮৩%)		
গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	১৬টি		

কৃষিজমির অবস্থান ঃ (১) উঁচু—২৮৮৮ হে. (২) মাঝারি—৫৭৭৬ হে.
(৩) নীচু—১৮৬২ হে. (৪) খরা প্রবণ—২৩৫৫ হে.
(৫) বন্যাপ্রবণ—৩০০০ হে.

মাটি ঃ বেলে-দোয়াঁশ, দোয়াঁশ ও এঁটেল-দোয়াঁশ
পি-এইচ—৫.৫-৬.৮ (আংশিক অম্ল) নাইট্রোজেন—স্বল্প হইতে মধ্যম
ফসফরাস—উচ্চ পটাশ—মধ্যম হইতে উচ্চ
ঘাটতি—জৈব কার্বন, বোরোন, ও জিংক (কিছু কিছু জায়গায়)

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত—১৪৭৫ মি.মি.

মূলফসল ঃ (১) ধান—(ক) আউশ-৩৫০ হে. (খ) আমন-৭৩৪০ হে.
(গ) বোরো-১৮০০ হে.
(২) পাট—২০২৫ হে. (৩) আলু—৪০৫০ হে.
(৪) সজ্জী—(ক) গ্রীষ্মকালীন-৬৫০ হে. (খ) বর্ষাকালীন-৬০০ হে.
(গ) শীতকালীন-২৪৫০ হে.
(৫) তিল—৩২০ হে. (৬) বাদাম—২০ হে.
(৭) মুগ ও কলাই—২০ হে. (৮) অড়হর—১০ হে.
(৯) গম—২৭৫ হে. (১০) সরিষা—৩৭৫ হে.
(১১) শীতকালীন ডালশস্য ঃ (ক) খেসারী-৭৫ হে. (খ) ছোলা-১৫ হে.
(গ) মুসুর-৩০ হে. (ঘ) মটর-২৫ হে.
(১২) সূর্যমুখী—১০ হে.
(১৩) বাগিচা ফসল—২০৮০ হে. (কলা, আম, পেঁপে ইত্যাদি)

শস্য নিবিড়তা (Croppng Intensity)—২২০ শতাংশ

বাৎসরিক কৃষি উপকরণের চাহিদা ঃ

১। বীজ

ক্রমিক সংখ্যা	বীজের নাম	মোট পরিমাণ মে.টন	ডিলারের মাধ্যমে পরিবর্তনের হার
১.	খারিফ ধান	৩৬০	২০%
২.	বোরো ধান	১২০	৪০%
৩.	পাট	১৫	১০০%
৪.	আলু	৪০০০	৪০%
৫.	গম	৩০	২৫%
৬.	তৈলবীজ	৪	২০%
৭.	ডালশস্য	৫	৮০%
৮.	সজ্জী	৩	

২। চুন। ডলোমাইট (জমির অম্লতানাশক)—১০০ মে. টন

৩। জৈব সার—৩০০ মে. টন

৪। রাসায়নিক সার ঃ নাইট্রোজেন—৩০০০ মে. টন ফসফরাস— ২০০০ মে. টন
পটাশ— ২০০০ মে. টন

৫। জীবানুসার—১.০ মে. টন

৬। কীটনাশক (১) কীটনাশক (ক) পাউডার— ৫.৫ মে. টন
(খ) তরল— ১০,০০০ লি.
(গ) দানাদার— ৮.০ মে. টন
(ঘ) গুঁড়ো— ১৫.০ মে. টন
(২) রোগনাশক (ক) পাউডার— ১৭.০ মে. টন
(খ) তরল— ৩,০০০ মে. টন
(৩) আগাছানাশক (ক) পাউডার— ১.০ মে. টন
(খ) তরল— ৩,০০০ লি.
(গ) দানাদার— ২.০ মে.টন

কৃষি উপকরণ বিক্রয় কেন্দ্র
(১) সমবায় সংস্থা— ১৫ টি (২) বীজ বিক্রয় কেন্দ্র—৫৯ টি
(৩) সার বিক্রয় কেন্দ্র—১৩৯ টি (৪) কীটনাশক বিক্রয় কেন্দ্র—৯০ টি

কৃষি ক্ষেত্রে সমস্যা ঃ

(১) এক-তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যাপ্রবণ। ডি.ভি.সি খালের শেষপ্রান্তে হওয়ায় বর্ষণের জল ও ডি.ভি.সি ছাড়া জল তাড়াতাড়ি গঙ্গায় পতিত হতে পারে না। গঙ্গার জলবৃদ্ধি ও নিকাশী নালা প্রশস্ত না হওয়ায় এবং সরস্বতী খাল মজে যাওয়ায় জল মগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

মানবাধিকার দিবসের প্রাক্কালে মেধা পাটকর কয়েকদিন এ রাজ্যে ছিলেন। ঐ সময় অন্ততঃ দু'বার তাঁকে সিঙ্গুরে যেতে বাধা দেয় পুলিশ। নন্দীগ্রামে একটি সভাতেও তিনি ভাষণ দেন। ঐ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মীরা সিঙ্গুর নিয়ে রাজ্য সরকারের তথা সি পি আই (এম) দলের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকেন। রাজ্য সরকার ও সি পি আই (এম) দলের নেতারা ঐ সময় যে অসত্য প্রচারের আশ্রয় নেন, মানবাধিকার দিবসের প্রাক্কালে মেধা তার উত্তরে নীচের প্রবন্ধটি লেখেন।

Singur - The truth about the subversion of truth

Singur: Looking Back, Looking Forward

Medha Patkar

on the Human Rights Day (10 December 2006)

Today when the world celebrates the 58th anniversary of the UN Charter of Human Rights as the International Human Rights Day, the people of Singur or Narmada or Raigad (Maharashtra), Dadri-Bajada (UP) cannot. They cannot be out of struggle for survival, for dignity, for life even for a moment to be able to breathe freedom and enjoy rights not just as citizens but as human beings.

The struggle of people of Singur continues at various fronts, ranging from the fasting group of women and men in Singur area itself to the one in Kolkata, from the everyday small and large actions by the representatives of various people's organisations to the solidarity fora of the academics. It has gone beyond the heated Metropolis to the various districts of North & South Bengal since the voice raised from Singur is echoed in other places, why battlegrounds, and has also effected other mass movements against similar onslaught of the corporatised State as in Midnapur district (against 2 SEZs & 1 Nuclear power plant). The prolonged violation of human rights and postponement of free, fair and informed dialogue on Singur is startling. With a large alliance and network of people's organisations beyond electoral political allies or opponents of the West Bengal Government, a possible dialogue could have been possible by now but for the over confident attitude and arrogance expressed by the West Bengal Government. The lack of initiative coming from anyone of the Left Front allies towards taking a serious cognizance and an urgent resolution through a decisive dialogue is certainly shocking.

With the police force still active, and Singur kept closed for many of us, with a misuse of law through section 144 IPC, alleging us of' malicious reasons', it is clear that there is no intention still to respect democratic rights, and freedom to question development plans by those facing the backlash.

Having come out of West Bengal, where the State kept me encircled by three to six police vehicles until I left, under watch day and night, arrested four times during a week but without following any formal or legal procedure, I look back and look forward with much revelation on this special day. Throughout last many days we heard of and even witnessed that the party cadres did not just move into the project affected areas but intimidated people… police continued its brutality and women kept narrating the story of policemen's misbehaviour of molestation while 18 of them (including 4 women activists) were charged (now bailed out) under section 307, (attempt to murder). Four youths and elderly people were seriously injured and hospitalised. It is obvious as to why some of us were not allowed to step in. Those in peaceful marches along with women activists and also journalists, were brutally lathicharged - why?

The obvious reason was and is, to hide the facts. It is another story that we still could investigate, beyond the public hearing held on October 27th and could get a survey of 400 families done through 15 eminent activists and journalists. We have already brought out the report by the panel with Mahasweta Devi, Justice (retd) Malay Senguptaji, and Deepankar Bhattacharyaji as other three members. The fact remains that the state of West Bengal neither opened the Singur area to us (as they did open even the Assembly after the unjustifiable event on December 1st) exhibiting selective transparency so as to allow the civil society only to see whatever the State would like them to, as a Bengali poem goes.

Singur remained all throughout my stay in Kolkata, a foreign territory to me, an Indian citizen without either a passport or a visa! It was indeed amusing, more than disturbing, that a lady police even climbed up (by

order) the aeroplane I took for return, in order to ensure that I was in the seat with belts. The only pleasant surprise was the people's mandate that was conveyed to me by no one else but the same policewomen who said to me in a hush-hush voice, "I am your fan. I need an autograph please." The courage and greatness not of a handful of activists but the people of Singur who have been persistent, is the only power that would challenge those who boast of the electoral mandate, ignoring and even crushing the electorate. The force to counter in the present politico-economic context with SEZs and STZs around, which no doubt are to be worse than Singur is the very mandate that is exploited and marketed for their own profit and

private interests of persons, parties as also those of the allied forces, at the cost of the people.

All throughout last two decades we, in the Narmada struggle, have had to face a distorted paradigm of development and a subversion of the total system to the powers- to- be. The generations old communities in the oldest of the river valleys civilizations in the world did not matter to those whose eyes were always on the giant designs and the games played through the vote banks. Every inch of land had to be saved or gained only through a battle at every front. With more than 1.5 lakh people(40,000 families) still in the submergence area and with much better rehabilitation policy in hands, the adivasis to other farmers in the hills and plains still have to continue the struggle for survival of ever increasing number of development victims Singur and its people are smaller yet significant new entrant to the battle field. One only hopes that all that the people of Narmada have faced and witnessed will not be a fate accompli for Singur too. Till date, however it seems inevitable that we begin and continue “Satyagraha” against the falsehood that is propagated as economics and development politics.

The CPM status report on Singur: Truth can not be subverted with power

Soon after coming out, into a ‘free zone’ this day, I could see a status report on Singur, compiled by the West Bengal Government, circulated by the office bearers of CPI(M). Much impressive with statistics, the report is presented as a counter to “the arguments against the project, not based on facts”, and as a truthful narration of bare facts in comparison to the “exaggerated claims of the atrocities” with a request to many “to see for themselves whether the LF Government deserves the criticism which some of our friends in the Ultra-Left are making.”

We should take this report seriously and welcome it. I do because, otherwise to this date, even this much of an official data-based statement was missing. No documents have come to us even upon written request and a promise by the Industries Minister, Mr Nirupam Sen.

It is also important that we know from the official source that our claims are considered to be exaggerated and the motives doubted.

A rejoinder to the status report thus is necessary and follows. First and the foremost, there is no level playing field. While the government or the party, CPM, has all access to the data and the documents, we do not. Apart from the gross violation of the RTI Act 2005, we, at least some of us, were not even allowed to go to the villages in this crucial phase of the struggle where one could check the official claims. In Narmada too, there is a battle over numbers but we are based in the field and not the government.

There too the Chief Secretary or the Managing Director, Narmada (Sardar Sarovar) Corporation writes to our eminent supporters against us, with allegations but we have lists, the submergence village level data and data from the rehabilitation sites in Gujarat and Maharashtra with which we can question and prove the Government to be wrong.

Here we have some lists, some statistics but collected under enormous pressure, against all odds by whoever could reach in. We again reiterate our stance: Open up Singur and we will find out the truth.

· Come one, come all…as party representatives, office bearers too and see the situation, assess it and take an appropriate stance.

· Jointly with us, form an impartial body, a Commission of Inquiry with three eminent members acceptable to all as honest and known for their integrity, with a six month period granted, and all official documents furnished to them. Let us furnish all of our data and present views before this commission and accept a status quo on land acquisition, on occupation, repression, and mass protests too.

Yet meanwhile let us comment and critique the CPI (M)/ West Bengal Government report.

1.The report is only on land acquisition and rehabilitation and there is nothing on the Tata Motors Project itself, neither the economics nor the MOU agreements and process of finalisation, except for a list of a handful of meetings.

2.All the nine meetings held within four months at the most have been held with the party representatives and Panchayat members (not much different from the former) but not with any Gramsabha, the community with all the Project Affected. Why? The 74th Amendment of the Constitution and the faith in democratic rights and process of planning would require this. It must happen, even now, with transparency.

3.It is clear that there are no details of the project, its cost and benefits, provided also to the Gram Panchayat and consent of the Gram Panchayat is also not sought, as reported to our panel for Public Hearing held at Gopalnagar on October 27th 2006, by Dhud Kumar Dhara, a member of GP.

4.The report is truthful about no consent granted by the local bodies and elected representatives and the fact that it was without any consensus that the land acquisition and the Project was and is being pushed ahead and hence the use of police force.

5.As we were saying all the time and were informed by the villagers, farmers, Bargadars, labourers, others themselves through many sources including personal hearing, there is opposition to the project by 45% to 50% of landholder–cultivators and a few thousand families of other workers

dependent on them, who are opposed to giving away their land. This was all through denied and ridiculed by the official sources, right up to the Minister for Industries and CM, who projected a picture of total consent. To quote CM himself, there is hardly 1% resistance. The same we found was informed to the President of India, the Governor of West Bengal and also probably the Tatas.

This status report brings out the reality to be different.

· Out of 997 acres, it was for 620 acres that consent was granted before passing the Compensation Award. We cannot accept this as given and will like to see the documents, under the RTI Act. Why not? In any case, it's not 100% or 99% families' consent.

· We also have affidavits recently proposed and submitted to us by individual farmers who have not and do not want to give away their land totalling 347 till now.

· Our number of landholders too was being challenged.

This report itself shows the landholders number for 635 acres to be 9020. This shows the small size of landholdings in the area as we claimed.

· What does post-award consent mean? It means consent under duress, when you complete acquisition under law, declare the same, it is not 'Free Prior Informed Consent', a pre-condition that is recommended for large dams and development projects in our Report of the World Commission on Dams, which I was a member of, and is also demanded by all democratic organisations. We must be allowed to look into the consent papers and have copies and get those checked with the villages themselves, please.

· Many of our friends and some of the LF partners too were asking for even a single case of dissent. More than this report our affidavits bring out many which can surely be checked and compared.

· The fact not mentioned is that most of those dissenting have not even accepted land acquisition notice under section 4 of the age old Land Acquisition Act, (which LF friends too challenge, as in their note on SEZ to the UPA) and hence acquisition in their case is ex-parte, on paper.

· It is also clear that there is no Rehabilitation Policy or package clearly put forth… except for cash compensation. As we know, there is no state level rehabilitation policy, either. Training for any vocation, in any technical work does not guarantee employment. · To offer such training as a complementary economic development activity is appreciable since there is underemployment and unemployment within the agriculturist families, but not destroying the existing employment in the agricultural sector. In any case the 189 trainees are not a big number.

· What would the families do with cash? The absentee landlords may invest in some trade etc., but will the cultivators be able to purchase alternative land of the same quality, of what magnitude, where and when?

The experience of cash swindled away leaving families impoverished has occurred in all the past projects; hence we demand land based rehabilitation in the Narmada dam too (where it is policy and hence 10500 families have got it… not without problems, though thousands remain deprived).

We demand in West Bengal a state level Rehabilitation Act for the minimum displacement that may occur for projects that would be justified and conceded to, by the affected people. We have already drafted a National Policy on Development Planning and the Advisory Council to UPA chaired by Sonia Gandhi, has already approved the National Draft. Let the LF take it up as our supporters and get enactment with one more consultation and finalisation, the earliest possible.

· We will certainly like to check on the trainee's list and the training offered, which is not fully possible in the present circumstances and atmosphere of intimidation.

· Our brief investigation and the status report itself show that many of the training programmes are yet to begin while occupation of their land has started. Whatever little programme has commenced, some of the trainees are from the project affected families and others are not. So why should the families face displacement to get such training which is a need of women and youths all over?

· It is also no guarantee of employment. The application forms filled by the trainee youths, state clearly that training does not mean the guarantee of a job! One knows from experience of industrialisation all over that the oustees don't get absorbed, they do not get a share in the benefits. The reasons, politico-economic, cannot be ignored.

· The report claims development works to have been undertaken in the affected area. Are these a part of rehabilitation?

Installing bore wells, excavations of silted water channels, building roads etc. are regular development activity and why should it wait for some big industry to acquire the area? The industrious population is to be deprived, agriculture with further potential for agro industry and harnessing water in this Damodar Valley Command area is to be lost….towards what end

· Even the cash compensation affected seems to be high to an outsider – Rs 6 to 9 lakh per acre as basic price and 9 to 13 lakh per acre paid price with solatium etc. We are told the actual market price for these two quality lands is actually almost double. Also, the land adjacent to the Durgapur

Expressway is too expensive. In today's world especially the urban, when land is gold its value is ever escalating. This is land near the metropolis and hence the Tatas want it too.

Why should the resident farmers part away with the same?

· The questions of course go beyond the rates and the market. First, should the displacement be imposed on people living with agriculture for generations? Second, what is our experience with rehabilitation?

Narmada and such tens and hundreds of projects are known but so are those in West Bengal. Damodar Valley Corporation affected too, and is yet to be rehabilitated. The research by Walter Fernandez of the Indian Social Institute, now at the North Eastern Social Research Centre, Guwahati, brings out that in West Bengal as other states, at least 70 lakh persons got affected due to the projects since 1947 till 2000, and only 9% of them are actually rehabilitated. This is too low a percentage compounded to that for other states (AP- 28%, Orissa- 33%, Goa - 34% & Kerala - 13%).

· There is no doubt, therefore that farmer-cultivators, registered bargadars to labourers in Singur are not for displacement, nor for rehabilitation. The report only mentions their numbers but not any opinion survey or referendum has been conducted. The numbers given by the official and the non-official also differ. The registered bargadars cannot be 237 and one must note that the 'operation barga' the popular land reform exercise was to be completed, not only registering all bargadars but as a second phase, granting them land rights too. This has not happened yet. That the land records are not updated, was accepted by Mr Nirupam Sen, Minister for Industries himself, who admitted that updating work is being done simultaneously.

· The experience of the Tata project-affected people else where also is and should be known to the people of Singur. The Tata's Indica project, comparable to Singur was established as an extension to its initial car-truck and other production enterprise, in Pimpri, Pune. Tatas were given 188 acres of land possessed by Pimpri Housing and Area Development Corporation that was supposed to be used for housing of labourers in the industrial belt. While 13000 per acre was the price paid to the oustees, Tata paid about 20 lakh/acre (now by the High Court order, it has to pay 60 acres for the loss in the deal suffered by the corporation), even though the same land cost about 80 lakhs per acre today. The Corporation also has had to accept that by mistake, it had allotted 15 acres more land to Tatas, which Tatas have to pay back.

But the most relevant fact to be noted is: employing some persons beyond 6 months on a temporary basis, no one from about only 125 families who lost their land for the project is employed in the factory which is highly mechanised and have altogether only 300 employees. Telco has

anyway slashed about 10,000 and more jobs during last 4 years and Tata steels downsized its workplace by 30,000 during one decade, as per estimate. It is obvious, therefore, that thousands of farmer-labourers of Singur have neither a guarantee nor a reserved place.

Moreover, what the Government of West Bengal report does not bring out truthfully is the issue of the human rights violation.

To say in the covering letter that none is hospitalised is not at all true. There are at least 4 persons who were hospitalised at Imambara Hospital, Chuchura, they were known to be in critical condition and one recently granted bail for an activist. The continuous presence of hundreds of (people say, thousands) policemen camping since end of November, hundreds of CPM cadre members marching around in the villages, intimidating people and so much of pain, anguish, struggle as also politicising is going on but no plain and fair dialogue. Why? Why is there no transparency, no accountability? Why is there no peaceful response to peaceful struggle, acknowledging democratic rights? One hopes this report and our rejoinder wanted at least to be a basis for the same. But the matter of grave concern is not merely numbers but also the ideological and development issues raised, beyond Singur, as well as at the places where much larger attacks on the farming populations are, planned.

Whether in Medinapur and other places in West Bengal of Orissa, in Maharashtra or Uttar Pradesh and Haryana, the fight has begun. The transfer of agriculture land affecting food security, destroying the living communities, widening the disparity between agriculture and corporate industry is also much more unacceptable when it is undemocratic and forcible.

Development cannot be furthered at the butt of the gun. It can be demonic growth, not development. The industrial growth or even the statutory welfare, nothing can be without justice at its core. The Left knows better.

The Left Front must take up a more honest position, deeper investigation and an ideologically consistent approach to development throughout the country. We look forward to a response protecting human rights, guaranteeing life and livelihood.

The day it happens, will surely be celebrated as the Human Rights Day.

Medha Patkar

সি পি আই (এম) এর পলিটব্যুরো সদস্যা বৃন্দা কারাতের নীচের লেখাটি ১৩ ডিসেম্বর ০৬ ‘দি হিন্দু’-তে এবং পরে তাদের ইংরাজি ও বাংলা মুখপত্রেও প্রকাশিত হয়। সিঙ্গুর প্রসঙ্গে উত্থাপিত বিষয়গুলিতে কোনো সরকারি বক্তব্য না থাকায় এটিকে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর আংশিক প্রতিফলন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

Singur: just the facts, please

Brinda Karat

THE SMEAR campaign against the Communist Party of India (Marxist) and the Left Front Government on the Singur issue has been marked by a remarkable absence of facts. Invective has replaced reason. The political acumen of the critics was on display when a comparison was made between the policies of the Buddhadeb Bhattacharjee Government, which only recently received a two-thirds majority from the people of Bengal, and the United States occupation of Iraq. So many wild allegations and fabrications have been hurled at the

CPI(M) and the Left that it becomes necessary to put the record straight. In respect of consultation, consent, compensation, and concern for employment generation, Singur stands in favourable contrast to what is being done in other States.

Untruth No 1: The common theme for the charge of double standards is that while the CPI(M) opposes ‘forcible’ acquisition of land elsewhere, in Singur its Government has done just that. According to them, “50-60 per cent of land is not sold and [the] majority of landholders in thousands are against the compulsory land acquisition and transfer of land and livelihood to the corporate.”

Fact: Of the 997 acres required, the Government has received consent letters from landowners for 952 acres. Three fourths of the 12,000 persons involved, including sharecroppers, have collected the share of the total compensation amount of Rs.131.49 crore and others are waiting to do so. The large numbers involved point to the fragmentation of the plots compared with other States where there are no land ceilings and where the same amount of land would have less than one third of the number of persons. This process has been going on under the public gaze for the last three months in a claims office set up in the area, with not a single complaint that it has been anything but democratic and transparent. Indeed this is the one government that has had numerous meetings with the affected people and called all party meetings several times to discuss the details of the project, the nature of land being taken over, and the compensation package.

Untruth No. 2: “There is no compensation policy for the landless agricul-

tural workers, unrecorded sharecroppers and rural households who are indirectly dependent for their lives and livelihood on land and agricultural activities.”

Fact: It is well recognised that West Bengal under the Left has ensured registration of the majority of sharecroppers through a bitter struggle. In Singur, all the 275 sharecroppers will get 25 per cent of what landowners will get; and 170 more sharecroppers who are not registered have applied for compensation, which is under consideration.

West Bengal agriculture is characterised by a relatively high share of family labour on self-owned farms. That is why the vast majority of workers in the area earn their income through non-agricultural work.

Government records for the five areas where land is being taken put the number of workers involved in non-agricultural work at around 7,700, including 1,000 women. Another 700 are involved in some type of household industry. Not surprisingly, the number of agricultural workers, around 1,230, is much less; and most of them have to do other work to ensure a minimum income. The Government has ensured alternative work for them. Already in that area, over 7,500 person-days of employment have been generated in the last few weeks. Employment for local workers will also be created in canal renovation, road widening, fence and building construction, and other activity. The Left Front Government is the only one in the country that has initiated different types of training programmes for landless workers and land losers, 1,800 of whom have already registered in different programmes. The effort is to ensure that alternative work and livelihood is ensured.

Untruth No. 3: Singur land is prime agricultural land.

While the CPI(M) opposes the acquisition of prime agricultural land in other States, in West Bengal it is doing the same thing.

Fact: According to Government records, approximately 90 per cent of the land is single crop. 175.5 acres of fertile land in the command area of the deep tube wells have been excluded and less fertile land included. Land has been changing hands faster in Singur than in any other part of West Bengal. Over the last year or so, there have been 572 private land transactions of approximately 300 acres of land, at one-third the rate given as compensation in the Singur project. This is the opposite of what is happening in other States, where land is being acquired from the peasantry at less than the market price. According to Census data, the share of fallow land, wasteland, pastures and so on is only 1 per cent in West Bengal compared with the national average of 17.6 per cent.

Clearly, for taking forward agricultural growth, expanding employment op-

portunities in agriculture, and ensuring industrialisation, a proper land use policy is essential. The State Government is preparing precisely this.

Untruth No. 4: "There was unheard of and unprecedented police brutality on December 1 — women are being sexually abused, their clothes torn off and children drowned in the local water bodies. Police had fired, several people are injured. [The] CPI(M) cadre are wearing police uniforms and terrorising the people."

Fact: This constitutes a cluster of fabrications so outrageous and so far removed from the truth that nobody takes them seriously. The report of the NGO 'fact-finding' team cannot name a single child thrown in a water body nor one woman who was sexually abused.

If there was brutal beating and repression, surely there would have been scores of people with fractured limbs and broken heads who would have no doubt been paraded before the media as proof. If there were police excesses the Government must take action. But as the women of Singur told me, in all these months when the process of giving consent was on, there was not a single policeman in their village. On the contrary, they said, 20 houses of those who had given land to the Government were damaged. Members of the Krishi Jami Raksha Samity (KJRS), an alliance of 19 parties ranging from the Right to the ultra-Left led by the local TMC MLA, tried to prevent the fencing work. Bombs were thrown at the police, which chased the crowd into the village, lathi-charged, and tear-gassed them.

When 12,000 directly affected people have given their consent and collected their compensation, it is clear that those who are involved in the violent protests, which are politically motivated, have little to do with the interests of those affected. The land has to be fenced off and the Government will be shirking its responsibility by not doing so. As the Chief Minister has said, it is unfortunate that the police had to use force against the demonstrators; but it is doubtful that a force attacked with bombs will respond differently anywhere.

The question arises: why Section 144? Why prevent people from visiting the area? Why the police force?

The provisions apply to all parties, including the CPI(M). However, the critics have double standards.

When the CPI(M) and its Kisan Sabha organised a demonstration in the villages earlier in November before Section 144 was imposed, it was described by the KJRS as "intimidation." When bombs are thrown at policemen and women, it is the democratic right to protest! The West Bengal Assembly was opened for two days to the general public and a hundred thousand people went inside to see the damage and vandalism of the State Assembly by TMC MLAs.

West Bengal has seen the havoc and violence wrought by a politically frustrated Opposition. Singur is their target. Those being mobilised are not the peasants or workers affected by the project — but others led by the Opposition. Such a situation is likely to lead to counter protests, causing a law and order problem.

Hence the use of Section 144. The sooner this is lifted, the better it will be but that is an assessment the Government will have to make.

The Left is conscious of the need to defend, consolidate, and advance the agrarian gains of the people of West Bengal. Nevertheless, the leaders of what are nowadays called 'social movements' would do well to recognise that a progressive, people-centred social and economic policy cannot proceed if the very process of industrialisation is seen as sinister and alien.

(Brinda Karat is a member of the Polit Bureau of the CPI[M].) ❐

গত ১৬ অক্টোবর ২০০৬ বাম দলগুলির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কাছে নীচের 'নোট'টি দেওয়া হয়। এ রাজ্যে সরকারের অনুসৃত 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' সম্পর্কিত কার্যকলাপ এবং সিঙ্গুর সহ অন্যত্র অনুসৃত কৃষিজমিতে 'শিল্পায়ন' এর নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০০৩' এবং সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রকাশিত *Doing Business in West Bengal–Polces, Incentives and Facilities* পুস্তিকাটিতে শিল্পপতিদের যে সব সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই নোটটিতে দ্বিচারিতা লক্ষণীয়।

Left Parties' Note on Special Economic Zones

The Special Economic Zones Act was passed by the Parliament in 2005. The intended purpose was to provide a stable policy framework for creating Special Economic Zones, which would serve as engines for industrial growth and exports. However, following the drafting of the SEZ Rules and the commencement of the process of granting approvals for the SEZs, a host of issues have surfaced which necessitates a relook at the entire SEZ Policy framework. Agricultural land is being acquired for the setting up of SEZs in several cases resulting in displacement of farmers and other sections of people, which have serious implications. Moreover, several provisions made in the SEZ Rules have raised concerns of misuse of the SEZ Act for creating a speculative real estate bubble instead of building industrial infrastructure. The Reserve Bank of India has warned against the possibilities of uneven development between different regions owing to the SEZ Policy. There are also apprehensions regarding substantial revenue losses on account of the tax concessions provided under the SEZ Act. In view of this,

a review of the current SEZ Act and Rules is urgently required. The relevant issues along with some suggested corrective steps are elaborated below, which the Government should consider.

Address the Land Question

A major difference between the Indian SEZ Policy and that of China, which had pioneered the creation of SEZs, is on the question of land. In the Chinese case, the State acquired the land and developed the required infrastructure, where private enterprises were invited to set up units. The land continued to be owned by the State. In the Indian case, private entities are being involved in developing the SEZ infrastructure. Land is being acquired by the State and handed over to private developers. Some of the proposed SEZs involve huge tracts of land, over 10000 hectares in some cases. If private entities are allowed to own such huge tracts of land, it would amount to the reestablishment of the zamindari system sixty years after independence. This is totally unacceptable.

Moreover, a thorough cost-benefit analysis of the SEZs, especially the giant-sized ones, from the point of view of rehabilitation and livelihood security of the displaced people, diversion of agricultural land and its implications for food security, the nature of urbanisation, usage of power and water and environmental impact assessment, is necessary before approving these projects. While land is a State subject and the cost-benefit analyses have to be undertaken by the State Governments before approving the SEZ proposals, the Central Government also needs to take a view on the important issues related to land acquisition, ownership and use. The following measures are suggested:

(a) There should be no transfer of land ownership to the private developer. Private developers should only be allowed to take land on lease or build the infrastructure on a BOT basis. Moreover, the Board of Approval for SEZs at the Centre should only consider those proposals, which have been duly approved by the State Governments.

(b) The Central Government should set an appropriate ceiling on the total land area under a SEZ, which can be developed by a private entity. In Section 5(2) of the SEZ Rules only minimum land area requirements for the different classes of SEZs have been mentioned. The maximum land area also needs to be specified here. Private entities should not be allowed possession or control of land beyond the stipulated ceiling.

(c) SEZs whose land area exceeds the specified ceiling should only be developed by the State (Public Enterprises of the Central or State Governments). The State can undertake Joint Ventures in developing such SEZs; but in such cases majority stake should lie with the public sector.

Selection of the private developers in the case of Joint Ventures should be made in a transparent manner.

(d) SEZs should be built on non-agricultural land and acquisition of agricultural land for the purpose of SEZs should be discouraged. A provision limiting the acquisition of agricultural land should be built into the SEZ Act itself.

(e) In case of displacement of farmers and other sections of people, it is important to ensure the livelihood security of the displaced families in addition to providing adequate compensation. The role of the Government in land acquisition should be geared towards protecting the interests of the people, especially the displaced families. The Government should frame a National Rehabilitation Policy, preferably through a Central legislation, in order to address the issues concerning rehabilitation of displaced families. Suitable amendments should also be made to the Land Acquisition Act in order to address these issues.

(f) A model compensation and rehabilitation criteria should be framed by the Central Government and included in the SEZ Rules, following consultation with the State Governments. It should be ensured that the current owners of land are awarded compensation in line with market prices taking into account the expectation of future land development. The suggestion that displaced families be given minor equity stakes in the companies floated for the purpose of building SEZs can be considered as an option. A provision must also be made to compensate those with long-term tenancy rights on the acquired land and farm labourers.

(g) The Government should urgently address the issue of unblocking and recycling of land and other assets of closed industrial units under liquidation. Data from the BIFR shows that recommendations for liquidation of 1254 private sector units, 31 Central PSUs and 41 State PSUs have already been sent to the High Courts. A fast track mechanism should be set up, by changing existing statutes if necessary, for unblocking the land of these closed units so that they can be made available for building SEZs or other industries.

Apply Appropriate Cap on Different Classes of SEZs

The initial cap of 150 on the total number of SEZs was later lifted by the Central Government. Since different classes of SEZs have been envisaged in the SEZ Rules, a cap on the total number of SEZs irrespective of its class and size makes little sense. However, if several large SEZs developed by private entities are allowed to come up in a few States, while many States do not receive any proposal from private developers, this will only aggravate regional imbalances. The RBI has also expressed concern on this issue in its latest Annual Report. It needs to be noted that the total

number of SEZs in China stands at six only. Moreover, the proliferation of proposals for setting up IT SEZs is clearly an attempt to take advantage of tax breaks. There is an apprehension of existing units shifting over to SEZs, which will result in loss of revenue that presently accrues to the Government.

Therefore, there should be separate caps for the total number of multi-product and sector specific SEZs. This also provides a further case for fixing an appropriate ceiling on the land area of SEZs developed by private entities. The Central Government should consider setting up of SEZs through public investment in those States where private investment is not forthcoming. This is important from the point of view of regional balance. A cap on the number of IT SEZs should also be set keeping in mind the revenue considerations.

Revise the Criteria for Processing/Non-Processing Area

The purpose of setting up SEZs is to promote foreign and domestic investments and exports of goods and services. However, certain provisions in the SEZ Rules prepared by the Ministry of Commerce and Industry have opened up the possibility of misuse of the myriad exemptions provided by the SEZ Act, which could thereby fuel a real estate bubble. According to Section 6 of the SEZ Act: "The areas falling within the Special Economic Zones may be demarcated by the Central Government or any authority specified by it as- (a) the processing area for setting up Units for activities, being the manufacture of goods, or rendering services; or (b) the area exclusively for trading or warehousing purposes; or (c) the non-processing areas for activities other than those specified under clause (a) or clause (b)." The Central Government had therefore reserved the right to determine how much of the land area under a SEZ should be allowed as non-processing area.

According to Section 5(2) of the SEZ Rules, while at least 50% of the land area needs to be earmarked for developing processing area for sector specific SEZs, the minimum processing area requirement for multi-product SEZs is only 25%. It is noteworthy that while the minimum land area requirement for sector specific SEZs is 100 hectares, for multi-product SEZs it is 1000 hectares. Therefore, while a developer of a sector specific SEZ of 1000 hectares is required to develop at least 500 hectares of processing area, the developer of a 1000 hectares multi-product SEZ is required to build only 250 hectares of processing area. This is a clear anomaly.

The processing area of SEZs should not be less than 50%. Further, 25% of the non-processing area should be dedicated for infrastructure development. Building of residential and commercial complexes should be permitted over 25% of the total land area. The SEZ Rules should be suitably

amended in this regard.

Regulate Land Use within SEZ Area

There are certain provisions contained in the SEZ Rules, which have given rise to apprehensions regarding misuse of the SEZ Policy. For instance, Section 5(4) of the SEZ Rules state that "The Developer or Co-Developer shall have at least twenty-six percent of the equity in the entity proposing to create business, residential or recreational facilities in a Special Economic Zone in case such development is proposed to be carried out through a separate entity or a special purpose vehicle being a company formed and registered under the Companies Act, 1956." However, no guidelines have been provided for the creation of such facilities, either in terms of land use or other essential regulatory parameters of such real estate development. The RBI has recently raised the interest cost of credit for real estate development in the SEZs. In keeping with such an approach, there is a need to regulate real estate development within the SEZs.

The SEZ rules have to clearly lay down norms for the development of infrastructural facilities by private developers within the SEZs, in terms of what is permissible and what is not. The role of the SEZ Authority and the Development Commissioner in this regard needs to be categorically defined. Most importantly, the SEZ Rules should contain a Land Use Plan for the giant SEZs. The issue of housing facilities for the workers in the giant SEZs have to be concretely addressed. Wherever residential complexes would be permitted within the SEZs, they should be built not only for the management and the white-collared employees but also for the workers. A situation where lakhs of workers of the SEZ units would be forced to stay outside the SEZ area leading to a proliferation of shantytowns in neighbouring areas should not be allowed to arise.

Review Tax Concessions

The revenue implications of the tax holidays being given under the SEZ Policy have to be seriously considered. According to media reports, internal estimates of the Finance Ministry suggest a revenue loss of Rs 1,75,487 crore against an estimated investment of Rs 3,60,000 crore. While these projected estimates are based upon certain assumptions, the issue cannot be brushed aside by saying that these revenue losses are "notional", as the Minister for Commerce and Industry has done in the Parliament. In a context where subsidies on food, fuel and fertiliser are being whittled down and the social welfare schemes promised in the NCMP being either underfunded or abandoned by the UPA Government citing resource constraints, the justifiability of the tax largesse to big business under the SEZ Policy needs to be thoroughly debated. Through the Note on Resource Mobilization submitted to the UPA Government-Left Coordination Commit-

tee in January this year, the Left parties had suggested that the Government should revisit the tax concessions under the SEZ Policy. Unfortunately, this has not been considered so far.

Given the concerns expressed from different quarters with regard to revenue loss, tax concessions in some areas in Chapter VI of the SEZ Act, under the "Special Fiscal Provisions for Special Economic Zones" need to be reconsidered by the Government:

(a) While customs and excise duty exemptions for units within the SEZs can be understood as measures to ensure price competitiveness of exports, the case for providing 100% exemption from income tax on profits for the first 5 years and 50% for the next 5 years by modifying the Income Tax Act, as has been provided in the Second Schedule of the SEZ Act, does not seem to be persuasive. Such fiscal incentives for new units, if it is to be given at all, should not be for more than 2 years, as was done in the case of Chinese SEZs. Income tax concessions for a period longer than 2 years should only be provided for the reinvested portion of profits, and that too only for a maximum of five years.

(b) Chapter VI of the SEZ Act provides for similar exemptions, drawbacks and concessions for the entrepreneurs setting up units within the SEZ and the developers of the SEZ. Thus private developers will be able to derive tax benefits without contributing to exports. The positive net foreign exchange earning requirement, specified in Chapter VI of the SEZ rules, is only valid for units within the SEZs and not the developers. Therefore the developers and the entrepreneurs should not be treated on par as far as tax exemptions and concessions are concerned. Fiscal incentives for developers, if they have to be provided at all, should be separately specified and should be considerably lesser than the ones provided for the entrepreneurs for income tax as well as customs and excise duties.

(c) Exemption from Service Tax has been granted to the developers in a Special Economic Zone in the SEZ Act. Moreover, units in the International Financial Services Centre and Offshore Banking Units have been given income tax exemptions equivalent to those of other units in the SEZs. Securities transactions entered into by non-residents through the International Financial Services Centre under a SEZ have also been exempted from the Securities Transaction Tax. These policies will simply encourage investors, including in financial services, to move from other locations in India to SEZ areas, with no benefit to the economy and substantial revenue loss. These exemptions, which are unrelated to exports, should not be granted.

(d) Section 50 of the SEZ Act state: "The State Government may, for the purposes of giving effect to the provisions of this Act, notify policies for

Developers and Units and take suitable steps for enactment of any law: - (a) granting exemption from the State taxes, levies and duties to the Developer or the entrepreneur". Thus the SEZ Act empowers the State Governments to take decisions related to exemptions of State taxes. However, Section 5(5) of the SEZ rules state that "Before recommending any proposal for setting up of a Special Economic Zone, the State Government shall endeavor that the following are made available in the State to the proposed Special Economic Zone Units and Developer, namely: - (a) exemption from the State and local taxes, levies and duties, including stamp duty, and taxes levied by local bodies on goods required for authorized operations by a Unit or Developer, and the goods sold by a Unit in the Domestic Tariff Area except the goods procured from domestic tariff area and sold as it is; (b) exemption from electricity duty or taxes on sale, of self generated or purchased electric power for use in the processing area of a Special Economic Zone". In effect, the SEZ Rules have imposed the granting of tax and duty concessions upon the State Governments, which is not in keeping with the spirit of the Act. Either this rule has to be amended or the Central Government should fully compensate the State Governments on the loss of revenue on account of these tax and duty exemptions.

(e) The granting of duty concessions to goods sold by a Unit to the Domestic Tariff Area should not be permitted, since such concessions are intended only for exports. This will imply major diversion of productive activities away from the Domestic Tariff Area to the SEZ, with substantial revenue loss for both the Central and State Governments.

Protect Worker's Rights

Section 5(5) (e), (f) and (g) of the SEZ Rules asks the State Governments to delegate powers under the Industrial Disputes Act to the Development Commissioner and to declare SEZs as Public Utility Services. These are incompatible with the SEZ Act, which does not contain any such provision. Such deviations of the SEZ Rules from the parent Act have to be corrected. The ILO recommendation regarding separation of powers between the Development Commissioner of an Export Processing Zone and the Grievance Redressal Officer should be seriously considered in this regard.

Prevent Enclaves of Speculative Finance

The provision for setting up Offshore Banking Units and International Financial Services Centres within the SEZS needs to be qualified. While the need for efficient financial intermediation and credit delivery for the purpose of industrial and export promotion within the SEZs is understandable, utmost care has to be taken to ensure that these financial entities do not develop as tax havens for speculative finance capital. There is no need for

providing tax breaks for the financial entities within the SEZs. All financial activities should be within the regulatory ambit of the RBI and subject to the same tax provisions regardless of whether their offices are physically located within the SEZ or the Domestic Tariff Area. Moreover, the RBI needs to ensure that the financial activities permitted within the SEZs are strictly related to the economic activities within the zone.

Amend SEZ Act and Rules

The suggestions made above involve several amendments to the SEZ Act and the SEZ Rules. The Left Parties believe that unless these changes are brought about, the SEZ Policy would degenerate into a free for all, which would have serious consequences. The UPA Government should therefore initiate a Review of the SEZ Act at the earliest with a view of making appropriate amendments. Amendments to the SEZ Rules can be made consequent to the Amendment of the Act. The Board of Approval should stop granting fresh approvals until the completion of the Review process. The changes suggested in the Land Acquisition Act and the formulation of a National Rehabilitation Policy, preferably through the passage of a Central legislation, should also be considered on an urgent basis.

প্রাসঙ্গিক আইনসমূহের যে ধারাগুলি এই সংকলনের বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে

ক. ভারতীয় সংবিধানের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি অনুচ্ছেদ

***Article* 21. Protection of life and personal liberty.**—No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

অনুচ্ছেদ *21.* জীবন ও ব্যক্তি(স্বাধীনতার সুর(া—আইনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি(কেই জীবন ও ব্যক্তি(স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা।

Article 39. Certain principles of policy to be followed by the State.—The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;

অনুচ্ছেদ *39.* রাষ্ট্রের পালনীয় কয়েকটি নীতিগত নির্দেশিকা (*principles of policy*)—রাষ্ট্রকে নিম্নোক্ত(গুলি অর্জন করার অভিমুখে নিজের নীতি পরিচালিত করতে হবে—

(a) যাতে জীবিকার্জনের পর্যাপ্ত উপায়ে নারী-পু(ষ সমভাবে নাগরিকদের অধিকার থাকে(

(b) সামূহিক বস্তুগত সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে বণ্টিত হয়, যাতে তা সাধারণ কল্যাণ সাধন করতে পারে(

(c) যাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালনার ফলস্বরূপ সাধারণ স্বার্থের (তিকরভাবে সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহ কেন্দ্রীভূত না হয়(

***Article 300A*. Persons not to be deprived of property save by authority of law.—** No person shall be deprived of his property save by authority of law.

অনুচ্ছেদ 300A. আইনী কর্তৃত্ব ছাড়া ব্যক্তি(কে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে না— কোনো ব্যক্তি(কেই তাঁর সম্পত্তি থেকে আইনী কর্তৃত্ব ছাড়া বঞ্চিত করা যাবে না।

সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী অনুসারে অনুচ্ছেদ *243* G (a)

***Article* 243G. Powers, authority and responsibilities of Panchayats**.- Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by

law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Panchayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein, with respect to-

(a) the preparation of plans for economic development and social justice;

অনুচ্ছেদ *243 G.* পঞ্চায়েতসমূহের (মতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব—এই সংবিধানের প্রাবিধান অনুসারে রাজ্য বিধানসভা আইন প্রণয়ন করে পঞ্চায়েতগুলি যাতে নীচের বিষয়গুলিতে স্বশাসনের প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করতে পারে তার জন্য তাদের হাতে প্রয়োজনীয় (মতা ও কর্তৃত্ব ন্যস্ত করতে পারে এবং এ রকম আইনে যে সব শর্ত নির্দিষ্ট করা হবে, সেই সব শর্তাধীনে পঞ্চায়েতের উপযুক্ত(স্তরে (মতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করার প্রাবিধান থাকতে পারে—

(a) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন(

খ. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের তিনটি অংশ

PREAMBLE (3rd paragraph)

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

মুখবন্ধ— তৃতীয় প্যারা

যেহেতু, শেষ পন্থা হিসেবে মানুষকে যাতে স্বেচ্ছাচার ও নিপীড়ণের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হতে হয়, তার জন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকার সমূহ সুর(িত হওয়া প্রয়োজন(

Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person.

অনুচ্ছেদ ৩ (১) প্রত্যেকেরই জীবন, ব্যক্তি(স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার আছে।

Article 17. (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

অনুচ্ছেদ ১৭ (১) প্রত্যেকেরই এককভাবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে।

(২) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে যথেচ্ছভাবে বঞ্চিত করা যাবেনা।

গ. তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ এর ধারা 8. (*1*) (d)

8. (*1*) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,—

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

8. (*1*) এই আইনে যা-ই থাকুক না কেন, কোনো নাগরিককে (নিম্নলিখিতগুলি) দেবার কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না—

(d) বৃহত্তর জনস্বার্থে সং(-ষ্ট তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন বলে উপযুক্ত(কর্তৃপ(নিশ্চিত না হলে ব্যবসায়িক গোপনীয়তা, বাণিজ্যিক গোপন তথ্য, মেধা সম্পদ সহ যে সব তথ্যের প্রকাশ কোনো তৃতীয় প(র প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে (তিগ্রস্থ করবে।

ঘ. THE LAND ACQUISITION ACT, 1894

Sub section (1) of Section 4, Section 5, Section 5A and Sub section (1) of Section 6 of the Act are quoted here :

4. Publication of preliminary notification and power of officers thereupon. -

(1) Whenever it appears to the [appropriate Government] the land in any locality [is needed or] is likely to be needed for any public purpose [or for a company], a notification to that effect shall be published in the Official Gazette [and in two daily newspapers circulating in that locality of which at least one shall be in the regional language], and the Collector shall cause public notice of the substance of such notification to be given at convenient places in the said locality [(the last of the dates of such publication and the giving of such public notice , being hereinafter referred to as the date of the publication of the notification)].

5. Payment for damage. - The officer so authorized shall at the time of such entry pay or tender payment for all necessary damaged to be done as aforesaid, and, in case of dispute as to the sufficiency of the amount so paid or tendered, he shall at once refer the dispute to the decision of the Collector or other chief revenue officer of the district, and such decision shall be final.

Objections

5A. Hearing of objections. - (1) Any person interested in any land which has been notified under section 4, sub-section (1), as being needed or likely to be needed for a public purpose or for a Company may, [within thirty days from the date of the publication of the notification], object to the acquisition of the land or of any land in the locality, as the case may be.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the Collector in writing, and the Collector shall give the objector an opportunity of being heard [in person or by any person authorized by him in this behalf] or by pleader and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, [either make a report in respect of the land which has been

notified under section 4, sub-section (1), or make different reports in respect of different parcels of such land, to the appropriate Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government]. The decision of the [appropriate Government] on the objections shall be final.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land were acquired under this Act.]

Declaration of intended acquisition

6. Declaration that land is required for a public purpose. - (1) Subject to the provision of Part VII of this Act, [appropriate Government] is satisfied, after considering the report, if any, made under section 5A, sub-section (2)], that any particular land is needed for a public purpose, or for a Company, a declaration shall be made to that effect under the signature of a Secretary to such Government or of some officer duly authorized to certify its orders [and different declarations may be made from time to time in respect of different parcels of any land covered by the same notification under section 4, sub-section (I) irrespective of whether one report or different reports has or have been made (wherever required) under section 5A, sub-section (2)];

[Provided that no declaration in respect of any particular land covered by a notification under section 4, sub-section (1)-

(i) published after the commencement of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1967 (1 of 1967), but before the commencement of the Land Acquisition (Amendment) Act, 1984 (68 of 1984), shall be made after the expiry of three years from the date of the publication of the notification; or

(ii) published after the commencement of the Land Acquisition (Amendment) Act, 1984 (68 of 1984), shall be made after the expiry of one year from the date of the publication of the notification:]

Provided further that] no such declaration shall be made unless the compensation to be awarded for such property is to be paid by a Company, or wholly or partly out of public revenues or some fund controlled or managed by a local authority.

[Explanation 1. - In computing any of the periods referred to in the first proviso, the period during which any action or proceeding to be taken in pursuance of the notification issued under section 4, sub-section (1), is stayed by an order of a Court shall be excluded.

Explanation 2. - Where the compensation to be awarded for such property is to be paid out of the funds of a corporation owned or controlled by the State, such compensation shall be deemed to be compensation paid out of public revenues.]

□□

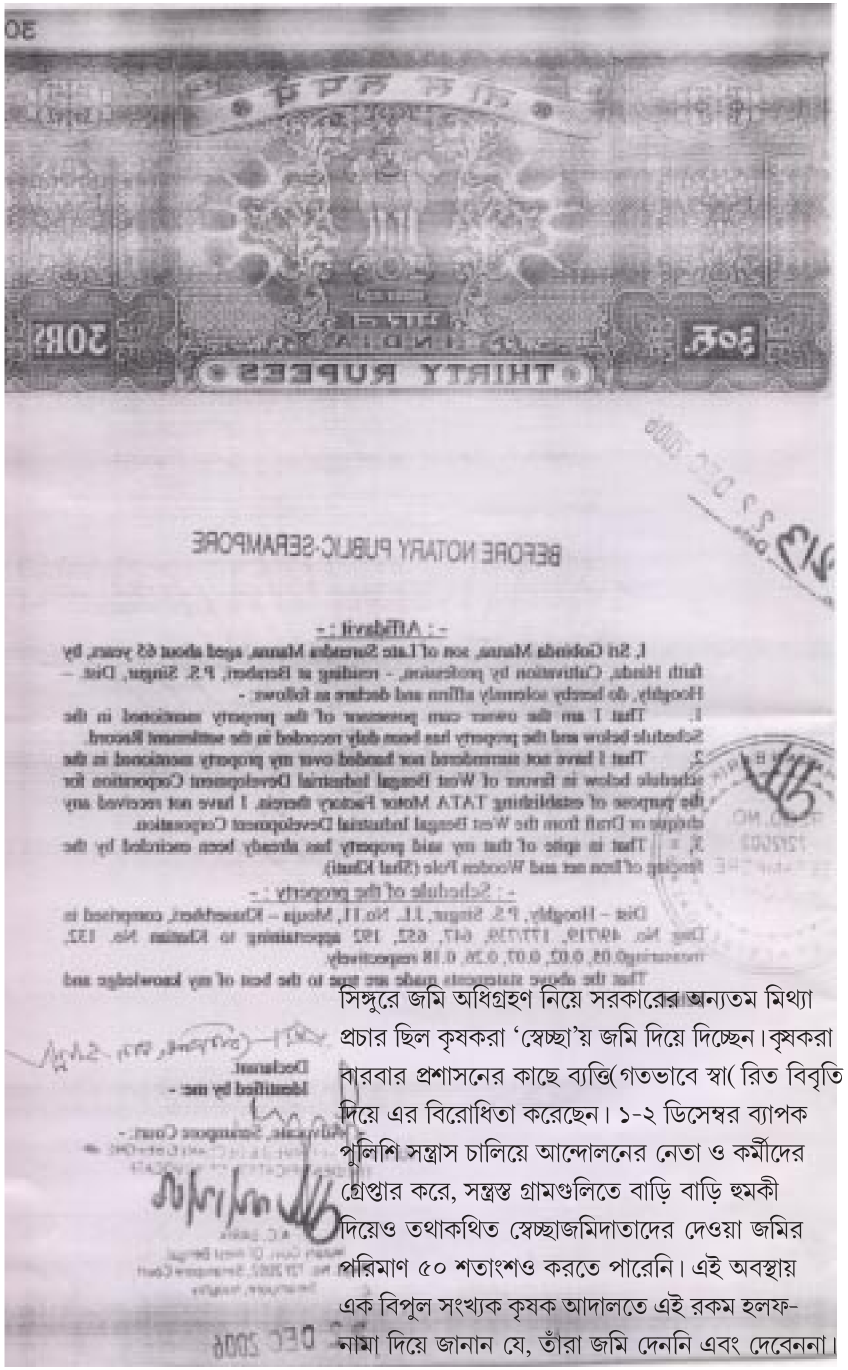

সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সরকারের অন্যতম মিথ্যা প্রচার ছিল কৃষকরা 'স্বেচ্ছা'য় জমি দিয়ে দিচ্ছেন। কৃষকরা বারবার প্রশাসনের কাছে ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষরিত বিবৃতি দিয়ে এর বিরোধিতা করেছেন। ১-২ ডিসেম্বর ব্যাপক পুলিশি সন্ত্রাস চালিয়ে আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে, সন্ত্রস্ত গ্রামগুলিতে বাড়ি বাড়ি হুমকী দিয়েও তথাকথিত স্বেচ্ছাজমিদাতাদের দেওয়া জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশও করতে পারেনি। এই অবস্থায় এক বিপুল সংখ্যক কৃষক আদালতে এই রকম হলফ-নামা দিয়ে জানান যে, তাঁরা জমি দেননি এবং দেবেননা।

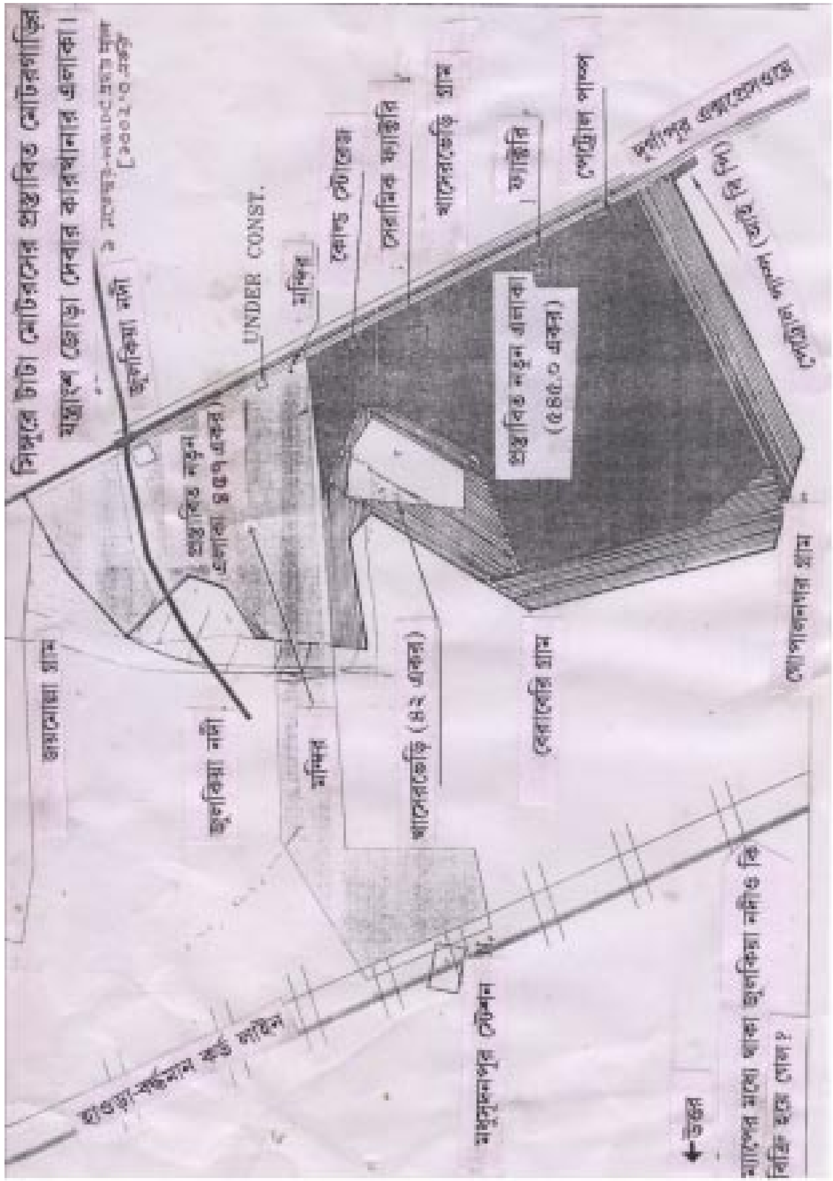

সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণ ও তার প্রতিবাদ—একটি অসম্পূর্ণ দিনলিপি

(১৮ মে থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬)

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে রাজ্যের সর্বত্র প্রতিদিনই সিঙ্গুর আন্দোলনের সমর্থনে অসংখ্য সভা-সমিতি-মিছিল-কনভেনশন হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে এবং আন্তর্জতিক স্তরেও এর ঢেউ পৌঁছেছে। এর সবগুলির উল্লেখ বাস্তবভাবেই অসম্ভব বলে সে চেষ্টা করা হয় নি।

মে ২০০৬

১৮ কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী-টাটা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে সিঙ্গুর প্রকল্পের কথা ঘোষণা।

২৫ সিঙ্গুরে জমি দেখতে গিয়ে টাটার প্রতিনিধিরা ঘেরাও।

২৯ শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনকে কালোপতাকা সহ বিক্ষোভ সহস্রাধিক কৃষকের।

জুন ২০০৬

১ ঝাঁটা, কৃষি যন্ত্রপাতি ও বলদ নিয়ে বি ডি ও অফিসে 'সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র ব্যানার নিয়ে কয়েক হাজার কৃষকের বিক্ষোভ।

৮ সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র প্রথম আনুষ্ঠানিক সভায় ৭০ জনের কমিটি গঠন।

১২ সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া গ্রামে বিক্ষোভের মুখে পরিদর্শনে আসা সি পি এম নেতারা।

১৫ এ পি ডি আর-এর ১৫ সদস্যের দলের তথ্যানুসন্ধান।

১৭ জেলাশাসক দপ্তরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

জুলাই ২০০৬

১৩,১৭ জেলাশাসকের কাছে জমি দিতে অনিচ্ছুক সহস্রাধিক কৃষকের লিখিত অসম্মতি জ্ঞাপন।

১৯-২৪ জমি অধিগ্রহণ আইন-১৮৯৪ধারা ৪(১) অনুযায়ী তেরটি নোটিশ জারি।

২৪ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে সিঙ্গুরের জনসাধারণের বিক্ষোভ।

আগষ্ট ২০০৬

১৮ জমি অধিগ্রহণ আইন-১৮৯৪ ধারা ৯(১) অনুসারে নোটিশ জারি ।

২২ বি ডি ও অফিসে সরকারি শুনানি—কৃষকদের বয়কট ও অবস্থান-বিক্ষোভ।

২৫ কৃষকদের সই করানোর ৭ দিনের চেষ্টা ব্যর্থ—অস্থায়ী ক্যাম্প গোটানো হল।

২৮-২৯ বি ডি ও অফিসে কৃষকদের ৪৮ ঘণ্টা অবস্থান-বিক্ষোভ।

২৯-৩১ জমি অধিগ্রহণ আইন-১৮৯৪ ধারা ৬ অনুসারে নোটিশ জারি।

সেপ্টেম্বর ২০০৬

১ কলকাতা বৌবাজারে সংহতি উদ্যোগের সারাদিন অবস্থান-বিক্ষোভ।

১-২ মহিলাদের পুরোভাগে রেখে বিক্ষোভের ফলে চূড়ান্ত শুনানির জন্য বাজেমেলিয়ায় জেলা আধিকারিকদের পশ্চাদপসরণ—নোটিশ জারির কাজ পরিত্যক্ত।

৩ সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি আয়োজিত কামারকুণ্ডু স্টেশন থেকে মিছিল।

৪ পি সি এফ এস-এর উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধানী দলের তথ্যানুসন্ধান।

৭ এ পি ডি আর-এর উদ্যোগে কলকাতা কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার মিছিল।

১০ এ পি ডি আর শ্রীরামপুর শাখা আয়োজিত যতীন লাহিড়ি স্মারক মুক্ত আলোচনা বিষয়—শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ—কৃষকের অধিকার ।

১০-১১ কংগ্রেসের উদ্যোগে সিঙ্গুরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ।

১৯ হুগলী জেলাশাসক দপ্তরে সংহতি উদ্যোগের সারাদিনের অবস্থান-বিক্ষোভ।

২০ টাটা মোটর কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত বলে ঘোষণা।

২১ সিঙ্গুরে উচ্ছেদ বন্ধে রাজ্যপালের কাছে হস্তক্ষেপের আবেদন কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের।

২১-২৩ জমি অধিগ্রহণ আইন-১৮৯৪ ধারা ৬ অনুসারে দাম ঘোষণার তারিখ দেখানো হয়েছে।

২৫ বি ডি ও অফিসে র‍্যাফ ও পুলিশের ঘেরাটোপে চেক বিলির চেষ্টা—সারাদিন শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত কয়েক হাজার নারী-পুরুষ-শিশুর উপর রাত ১-৪০ নাগাদ র‍্যাফ ও পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ, কয়েকশো মানুষ আহত—সাংসদ মমতা ব্যানার্জী, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সহ ৭৩ জন গ্রেপ্তার।

২৬ বি ডি ও অফিসে পুলিশি তাণ্ডবে আহত গোপালনগর মধ্যপাড়ার রাজকুমার ভুলের মৃত্যু। রাজকুমারকে সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদের মর্যাদা। বেলা ১১টা থেকে ১২ টা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সারা রাজ্যে রাস্তা ও রেল অবরোধ।

২৭ এস ইউ সি আই ও সি পি আই (এম-এল) লিবারেশনের ডাকে সিঙ্গুর বন্ধ। সেখানে বিশাল মিছিল। কলকাতা ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ, সংহতি উদ্যোগের ধিক্কার মিছিল।

২৮- সিঙ্গুরে সমস্ত দুর্গাপূজা বন্ধ।

অক্টোবর ২০০৬

১ বিজয়া দশমীর দিনে সিঙ্গুরের ক্ষতিগ্রস্ত মৌজাগুলিতে নিস্প্রদীপ পালন। সিঙ্গুর থেকে সরে আসার জন্য রতনলাল টাটাকে সুপ্রীম কোর্টের দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জে এস ভার্মা ও রাজেন্দ্র বাবু এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এন রাও-এর চিঠি।

৩ লক্ষ্মীপূজার দিনে সিঙ্গুরের বিভিন্ন গ্রামে অরন্ধন পালন।

৪ সরকারি উদ্যোগে সর্বদলীয় বৈঠক—তৃণমূল কংগ্রেসের বয়কট। দু-এক দিনের মধ্যে অধিগৃহীত জমির দখল নেওয়া হবে বলে সরকারের ঘোষণা

৮ ৯ অক্টোবর প্রস্তাবিত বন্ধের সমর্থনে সিঙ্গুরে বিশাল সর্বদলীয় মহামিছিল।

৯ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী সামাজিক ও গণ সংগঠনের ডাকে ১২ ঘণ্টার সর্বাত্মক বাংলা বন্ধ—৬২১১জন বন্ধ সমর্থক গ্রেপ্তার।

১২ হুগলী জেলাশাসকের কাছে সংহতি উদ্যোগের ডেপুটেশন, বি ডি ও অফিসে পুলিশি তাণ্ডব ও রাজকুমার ভুলের হত্যার বিষয়ে এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট প্রকাশ।

১৪ কলকাতা ভারতসভা হলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ফিয়ানের উদ্যোগে নাগরিক কনভেনশন। শিল্পায়নের জন্য কৃষিজমি ধ্বংসের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং-এর চিঠি।

১৫ সিঙ্গুরে ২৫ সেপ্টেম্বরের পুলিশি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে লজ্জা দিবস পালন।

১৭ বলপ্রয়োগ করে সিঙ্গুরের কৃষকদের উচ্ছেদ বন্ধে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজ্যের দশটি বিশ্ববিদ্যালয় ও আই আই টির ১৩০ জন অধ্যাপকের আবেদন।

১৮ কলকাতা টাটা সেন্টারের সামনে সিঙ্গুরের সহস্রাধিক কৃষক মহিলার বিক্ষোভ।

২১ দেওয়ালির রাতে সিঙ্গুরের গ্রামগুলিতে সম্পূর্ণ নিস্প্রদীপ পালন।

২৭ সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে শিল্পায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি ও সংহতি উদ্যোগের আয়োজনে মেধা পাটকর, মহাশ্বেতা দেবী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত ও দীপংকর চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত প্যানেলের সামনে জনশুনানি। সন্ধ্যায় বাজেমেলিয়া হাসপাতাল মাঠে বিশাল জনসভা।

২৯ জনশুনানির বিচারকমণ্ডলীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করলেন না। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে মেধা পাটকর, জাস্টিস মলয় সেনগুপ্ত ও দীপংকর চক্রবর্তীর কথাবার্তা।

নভেম্বর ২০০৬

৩ কলকাতায় নাগরিক মঞ্চের আহ্বানে নাগরিক কনভেনশন। সরকারের বিরুদ্ধে ১০ দফা অভিযোগপত্র পেশ। সিঙ্গুরে এস ইউ সি আই-এর জনসভা

৪ জমি দখল আটকাতে আই এন টি ইউ সি (সুব্রত মুখার্জী)র দুটি ক্যাম্প শুরু।

৫ সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা কমিটির বিরাট সমাবেশ।

৭ সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির দুটি ও সারাভারত কৃষিমজুর কমিটির একটি ক্যাম্প শুরু।

৮ সিঙ্গুরে সি পি আই (এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসির জনসভা।

১২ বেড়াবেড়ি মৌজার তালতলা গ্রামে মহিলাদের তাড়া খেয়ে পুলিশবাহিনীর পুলিশ ক্যাম্প করা হলনা।

১৩ সিঙ্গুরে রাজ্য সরকারের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে সারা ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠনের প্রতিবাদ—রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন।

১৬ সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আহ্বানে আন্দোলন সমর্থক সংগঠনগুলির সভা।

১৭ কলকাতা গান্ধিমূর্তির পাদদেশ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের 'ডাণ্ডী অভিযান'।

১৯ গ্রামগুলি থেকে পুলিশ ক্যাম্প সরানোর দাবিতে সিঙ্গুরে বিশাল মিছিল।

২৯ বাইরে থেকে বাস-লরি বোঝাই লোক এনে সিঙ্গুরে বামফ্রন্টের সভা। বিমান বসু সহ বামফ্রন্ট নেতাদের উপস্থিতিতেই সাংবাদিকরা আক্রান্ত।

৩০ চন্দননগর মহকুমা শাসক কর্তৃক সিঙ্গুর থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি। বিশাল পুলিশি প্রহরায় অধিগৃহীত জমিতে বেড়া দেওয়া শুরু। সিঙ্গুরে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে যোগ দিতে যাবার পথে মমতা ব্যানার্জীকে আটকে পুলিশি হেনস্থা। প্রতিবাদে বিধানসভার লবিতে মমতা ব্যানার্জীর অবস্থান। বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের ভাঙচুর।

ডিসেম্বর ২০০৬

১ গণতান্ত্রিক অধিকার ও জীবন-জীবিকার অধিকার রক্ষার দাবিতে ও পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল সহ কয়েকটি সংগঠনের ডাকে ১২ ঘণ্টা বাংলা বন্ধ। পাকা ফসল ভর্তি বা আলু বীজ বসানো মাঠে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমিতে ১৬০০ পুলিশের পাহারায় বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু। কৃষকদের প্রতিরোধ—পুলিশের সঙ্গে ইতস্তত সংঘর্ষ ।

২ বেড়া দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষদের উপর পুলিশ-কম্যাণ্ডো-ক্যাডার যৌথ আক্রমণ। গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঢুকে নির্বিচার লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রবার বুলেটের আঘাতে অসংখ্য আহত। ২ জন নাবালিকা, ১৬ জন মহিলা সহ ৬৪ জন গ্রেপ্তার। পুলিশি সন্ত্রাসের তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া এ পি ডি আর কর্মী রাংতা মুন্সী ও স্বপ্নাও গ্রেপ্তার। সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ ও নানা জায়গায় অবরোধ। সন্ত্রাসের পরিস্থিতি দেখতে গেলে মেধা পাটকর, দীপংকর চক্রবর্তী, অমিতদ্যুতি কুমার ও সুমিত চৌধুরি গ্রেপ্তার। রাজ্য সরকার মেধাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হবার প্রস্তাব দিলে মেধার প্রত্যাখ্যান। চন্দননগর থানায় এ পি ডি আর এর বিক্ষোভ। বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি সহ বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ

৩ সারা রাত পুলিশ ভ্যানে কাটিয়ে আটক গ্রামবাসীদের মুক্তির দাবিতে চন্দননগরের প্রধান রাজ পথে মিছিল ও থানার সামনে সারাদিন অবস্থান বিক্ষোভে মেধা পাটকর সহ অন্যদের অংশগ্রহণ ।

৪ পুলিশি সন্ত্রাস ও জোর করে কৃষিজমি নিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই সহ কয়েকটি সংগঠনের ডাকে ১২ ঘণ্টা বাংলা বন্ধ। কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আহ্বানে কলকাতায় মমতা ব্যানার্জী সহ অন্যান্যদের অনির্দিষ্টকালীন অনশন ধর্মঘট। সিঙ্গুরে পাঁচটি স্থানে কৃষক রমনী ও পুরুষদের অনশন শুরু। খোনে